পিসী-মা

গার্হস্থ্য উপন্যাস

"পিসী-মা" প্রণেতার অন্যান্য গ্রন্থাবলী

সচিত্র উপন্যাসাবলী	
স্ত্রীপাঠ্য	রাজসং, সুলভসং
কাকী-মা	১৲, ৸৹
গৌরী-দান	১৷৹, ১৲
আর্য্য-কাহিনী	৷৵৹, ৷৹
বিষ-বিবাহ	৷৴৹
সতী কি কলঙ্কিনী	৷৴৹
অঞ্জলি	৷৷৵৹
কনে-মা (যন্ত্রস্থ)	

সচিত্র নাটকাবলী	
পৌরাণিক	
উর্ব্বশী-উদ্ধার	৷৷৵৹
বভ্রুবাহন	৷৵৹
মৈথিলী	৷৵৹
(রাবণ-কন্যা সীতা)	
আকবরের স্বপ্ন	৸৹
(প্রকাশিত)	

পিসী-মা

গার্হস্থ্য উপন্যাস

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত

Calcutta

THE BENGAL MEDICAL LIBRARY,

201 Cornwallis Street.

1912.

মূল্য বোর্ডে বাঁধা ১৲ টাকা   কাপড়ে বাঁধা ১।০ সিকা

Calcutta

PUBLISHED BY THE AUTHOR

FROM THE "BOSUDHA-AGENCY"

22, Fakir Chand Chakraburtty's Lane.

Printed by Fakir Chandra Das

"INDIAN PATRIOT PRESS."

70, BARANOSI GHOSE'S STREET.

ILLUSTRATED BY SRIJUT PREO GOPAL DASS.

1912.

এই পুস্তক মূল্যবান্ স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক-উভ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত

মহাশয়েষু—

মহাত্মন্ !

একদিন এ দীন আপনার মঙ্গলাশিসে এ জগতে স্বর্গের নন্দন-সৌন্দর্য্যের আভাস দেখিয়াছিল, এবং আপনার প্রদত্ত প্রীতিলতার স্নেহ-স্নিগ্ধ শান্তচ্ছায়ায় তাহার ক্ষুদ্র সংসার যে প্রগাঢ় বিশ্রামলাভ করিতেছিল, তাহাও অপার্থিব ; কালচক্রের নিষ্ঠুর আবর্ত্তনে পড়িয়া তাহা এখন লোক-লোচনের বহির্ভূত, কিন্তু সে মাধুরীময়ী স্মৃতি আমার অস্থি, মেদ, মজ্জায়—হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে, "রাজরাজেশ্বরী" রূপে অধিষ্ঠিতা। জীবনে তাহা ভুলিবার নয়, মরণে পাছে সে স্মৃতি মুছিয়া যায়, সেইজন্য আমার দুর্ব্বল কল্পনা-প্রসূত "পিসী-মা" গ্রন্থ আপনারই নামে উৎসর্গী-কৃত হইল।

নশ্বর জগতে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলেও, "তাহার" স্মৃতি "পিসী-মা", স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, যুগযুগান্তরকাল আপন বক্ষে ধারণ করিবে।

গ্রন্থকার

বিজ্ঞাপন

বহুকাল মুদ্রাযন্ত্রের কারাক্লেশ উপভোগের পর, নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া "পিসী-মা" আজ জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হইল। ইহা প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইবার কথা, কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে, তাহা অচিরে কার্য্যে পরিণত করা বহু আয়াস সাপেক্ষ। সংসার-সমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গাভিঘাতে হৃদয় জর্জ্জরিত হওয়ায়, আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারি নাই, সেজন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণে সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

"পিসী-মা" উপন্যাস যে যে কারণে এত বিলম্বে বাহির হইল, তাহার কৈফিয়ৎ শুনিলে বোধ হয়, কেহ আমার উপর বিরক্ত হইবেন না।

সর্ব্বপ্রথমে যখন আমি "পিসী-মা"র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হই, সে সময়ে ভূতপূর্ব্ব ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দত্ত মহাশয়, মৎপ্রণীত "গৌরী-দান" উপন্যাসখানি তাঁহার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ মনোনীত করেন, এবং আমাকেই উহা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে বলেন। তাঁহার অনুরোধে আমি ক্ষীণশক্তি লইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হই; কিন্তু নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত গৌরী-দানের পাণ্ডুলিপি (সময়াভাবে নকল না রাখিয়া) বিহারী বাবুকে প্রদান করিবার অল্পদিন পরেই ন্যাশন্যাল থিয়েটার, প্রোথিতযশা অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের হস্তগত হয়; বিহারী বাবু "গৌরী-দান" নাটকের পাণ্ডুলিপি অমর বাবুকে প্রদান করেন। পাণ্ডুলিপিখানি যে অমরেন্দ্র বাবুর হস্তগত হইয়াছে, তাহা তিনি পত্রোত্তরে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিন্ধু সমপ্রাণে আমার বিন্দুপ্রায় অকিঞ্চিৎকর "গৌরী-দানে"র কথা যে মনে থাকিবে, এ আশা আমার নাই।

"গৌরী-দান" নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের পর পুনরায় যখন আমি "পিসী-মা" প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার পত্নী সামান্যরূপ রোগাক্রান্তা হন, সেই ব্যাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অকালে মৃত্যুকবলে টানিয়া লয়, এই ঘটনায় আমি একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়ি।

ছয় মাসকাল পরে, বন্ধুবান্ধব ও পৃষ্ঠপোষক সদৃশ, নানা স্থানের লাই-ব্রেরীর অধ্যক্ষগণের পুনঃ পুনঃ তাগীদ-পত্র ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া, "পিসী-মা"র পরিসমাপ্তি করিয়াছি।

আরও স্বীকার করিতেছি যে, নানা স্থান হইতে অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় মৎপ্রণীত "কাকী-মা" ও গৌরী-দান" অভিনয়ার্থ আমায় নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন, সময় ও শক্তির অল্পতাবশতঃ আমি তাঁহাদের সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি না। "পিসী-মা" যাহাতে অল্প প্রয়াসে নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করা যায়, সেজন্য ইহা নাটকীয়কৌশলে অনেকটা গঠিত করিয়াছি, এবং ন্যাশন্যাল থিয়েটারের জন্য "গৌরী-দান" নাটকে আমি যে সকল সঙ্গীত সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম, তাহা হইতে কয়েকটী গান "পিসী-মা"য় বাহির করিয়াছি।

জানি না, "পিসী-মা" জনসাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে কিনা। তবে এই-মাত্র বলিতে পারি যে, ইহা আমি মাতৃস্বরূপিণী বঙ্গকুলললনাগণের ও ভ্রাতৃ-সম বঙ্গীয় যুবক প্রভৃতির পাঠোপযোগী করিতে সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি।

আশা উচ্চ, শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষীণ, ত্রুটি অনিবার্য্য; ভরসা, সুধীজন-গণের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, সে সকল সংশোধন করিতে সমর্থ হইব।

২রা আশ্বিন,—সন ১৩১৯ সাল,
বসুধা-কার্য্যালয়
২২ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার

পিসী-মা

গার্হস্থ্য উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদত্যাগ

চৈত্র মাস, বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে, মার্ত্তণ্ডের উজ্জ্বল প্রভা তখনও ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর অবস্থায় পশ্চিম গগনপ্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে। অনন্ত অম্বরের সন্নিকটে শকুনি, গৃধিণী, চিল প্রভৃতি উড্ডীয়মান বিহঙ্গমগণ উড়িতে উড়িতে ক্রমে ক্রমে মানবের দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেছে। প্রাণীগণ সুপ্রশস্ত শ্যামল ময়দানে, ইচ্ছামত বিচরণ ও আহার করিয়া সানন্দভরে উদ্ধপুচ্ছে স্ব স্ব আলয়াভিমুখে ফিরিতেছে। অফিসের কেরাণীকুল, কারামুক্ত কয়েদীর ন্যায় সহাস্যমুখে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। এমন সময়ে কলিকাতার অন্তর্গত বালিগঞ্জের এক অট্টালিকার বৈঠকখানায় বসিয়া, জনৈক ভদ্রলোক কয়েকটী বালককে শিক্ষাদান করিতেছিলেন।

ভদ্রলোকের নাম হরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, উপাধিধারী। হরেশচন্দ্রের পৈত্রিক সম্পত্তি না থাকিলেও তিনি নানা উপায়ে নিজ অধ্যবসায় গুণে সরস্বতীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কমলাদেবী তাঁহার উপর বড় সুপ্রসন্না ছিলেন না। তিনি বি, এ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাবিয়াছিলেন যে, এইবার বি, এল পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার একজন আদর্শ উকীল হইয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিবেন। তাঁহার পিতৃদেব, স্বীয় জীবনে বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া, পুত্রকে ওকালতী পরীক্ষা দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু কুটীলকাল তাহাতে বাদ সাধিল, তিনি অকালে লোকান্তরিত হইলেন। যুবক হরেশচন্দ্রের উপরে সংসারের সকল ভার পড়িল, তিনি জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া, দাসত্ব করিয়া সংসার চালাইতে বাধ্য হইলেন। হরেশচন্দ্র প্রথমে অফিসে কেরাণীকুলের দল বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সওদাগরি অফিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীর সমধিক কদর নাই বুঝিয়া তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন; তাঁহার তেমন অভিভাবক না থাকায়, তিনি গভর্ণমেণ্ট অফিসে কোন কর্ম্মপ্রার্থী হইবার আশাও করেন নাই। দিন দিন তাঁহার অভাব বাড়িতে লাগিল, সংসারে যন্ত্রণার এক শেষ। এফ এ, পাশ করিয়া তিনি দারপরিগ্রহ করেন। মা ষষ্টির অনুগ্রহে অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি দুইটী কন্যার পিতা হইয়াছেন, বৃদ্ধা জননী পুত্রের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন, প্রাণপ্রিয়া অর্দ্ধাঙ্গনী তাহার বড় সাধের অলঙ্কারগুলি এক-একখানি করিয়া পতির হস্তে সঁপিয়া দিয়াছিল, পতিও ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতেছিলেন। কিন্তু এরূপ করিয়া আর কতদিন চলে? এখন তাহার সালঙ্কৃতা অর্দ্ধাঙ্গিনী যে নিরলঙ্কৃতা হইয়াছে। তাহাই হরেশচন্দ্র অর্থোপার্জ্জনে বদ্ধপরিকর হইয়া এই বালক-বালিকাদিগের শিক্ষকতা করিতেছিলেন।

বালকগণের বয়স বড় বেশী নয়, একজনের বয়স পাঁচ বৎসর, একজনের সাত ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠের বয়স নয় বৎসর হইবে।

হরেশচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে এই নয় বৎসরের বালক কমলকৃষ্ণকে পড়া-

ইতেছিলেন, পাঁচ বৎসরের অমল ও সাত বৎসরের বিমলকৃষ্ণ ধারাপাত দেখিয়া শতকিয়া ও কড়াকিয়া মুখস্থ করিতেছিল। এমন সময়ে তথায় একখানি জুড়িগাড়ী আসিবার শব্দ পরিশ্রুত হইল। হরেশচন্দ্র কমল-কৃষ্ণকে পড়া বলিয়া দিয়া অমল ও বিমলকৃষ্ণকে বলিলেন, "দেখি, তোমরা কেমন ধারাপাত মুখস্থ করেছ।"

বিমল কহিল, "এখনও ভাল হয় নাই, মাষ্টার মশাই।"

অমল কহিল, "আমার হয়েছে মশাই।"

শুনিয়া হরেশচন্দ্র অমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, পাঁচের পিঠে দুই কত?"

অমল কহিল, "বাইশ।"

হরেশচন্দ্র ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কৈ, তোমার ত পড়া হয় নাই। আচ্ছা—এইবার বল দেখি, দুয়ের পিঠে নয় কত?"

অমল তাড়াতাড়ি করিয়া কহিল, "উনিশ।"

হরেশচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঁচের পিঠে নয়?"

অমল কহিল, "উনচাল্লিশ!"

ঠিক এই সময়ে বহির্দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিল। একটি চোগা চ্যাপকান, প্যাণ্টপরিধারী যুবা পুরুষ সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া একবার বালকগণ ও হরেশচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, গাড়ী স্বস্থানে চলিয়া গেল।

হরেশচন্দ্র অমলকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ব্যস্তভাবে তাহা-দিগের সকলকে পাঠে অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে বলিলেন, এবং কিয়ৎকাল উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগের পাঠ স্বয়ং পড়িয়া দিলেন। তৎ-পরে তিনি বালকগণকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, "দেখ, তোমরা যদি সংসারে বড় হইতে চাও, তাহা হইলে আগে ছোট হইতে শিখিবে,

যাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা বড়, কখনও তাঁহাদিগকে অমান্য করিবে না, ছোট ভাই ভগ্নীদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিবে, কখনও তাহাদিগের সহিত কলহ করিবে না। যে কার্য্য করিলে দশজনে নিন্দা করে, এমন কার্য্য করিবার ইচ্ছাও করিও না।”

যে যুবাপুরুষ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে ধড়াচূড়া ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া এক শোফায় শয়ন করিলেন, আর তদ্দণ্ডেই একটি ভৃত্য আসিয়া তাঁহার তামাকু সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

এ বারান্দাটী এরূপভাবে অবস্থিত যে, তথা হইতে বৈঠকখানায় দৃষ্টিচালনা করিলে সমস্ত পরিদৃষ্ট হয়, যুবা একজন লালবাজার পুলিস-কোর্টের প্রতিপত্তিশালী উকীল, নাম শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি হরেশচন্দ্রের উপদেশের কথা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, শোফায় শায়িতাবস্থায় গড়গড়ার নল মুখে দিয়া ধূম পান করিতে করিতে হরেশচন্দ্রকে কহিলেন, “মাষ্টার মশাই! আপনি দেখছি, ছেলেগুলোকে মাটি করলেন, লেখাপড়া শিখান চুলোয় গেল, কেবল বাজে কথায় সময় নষ্ট করেন।”

শুনিয়া হরেশচন্দ্র কহিলেন, “আজ্ঞা না, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিতেছি, বালকেরা যাহাতে না কুপথে পরিচালিত হয়, পরস্পরে কলহ বিবাদে লিপ্ত না থাকে, সেজন্য তাহাদের পূর্ব্ব হইতেই উপদেশ দেওয়া উচিত।”

শ্রীশচন্দ্রের অনতিদূরে অবস্থিতা পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া পত্নী নাসিকায় দোদুল্যমান নথ ঘুরাইয়া তাঁহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া কহিল, “ও মিন্‌ষে রোজই ছেলেগুলোকে ঐ রকম কথা বলে, বোধ হয়, আমাদের ঠেস্ দিয়ে ও এসব কথা কয়।”

কুক্ষণে হরেশচন্দ্র আজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, অদৃষ্টবৈগুণ্যে তিনি আজ শ্রীশচন্দ্রের কোপনেত্রে পড়িলেন; শ্রীশচন্দ্র পত্নীর কথা শুনিয়া গড়গড়া ফেলিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া হরেশচন্দ্রকে কহিলেন, "দেখুন, আপনি রোজই ছেলেদের কাছে নানা রকম বাজে কথা কয়ে সময় নষ্ট করেন, অথচ এক রাশ টাকা পেয়েও ছেলেদের কিছুই শেখাতে চান না; ছেলেগুলোকে পড়া জিজ্ঞাসা কর্‌লে, একটা কথার বানান কি অর্থ বল্‌তে পারে না।"

হরেশচন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে, এতে আর আমার অপরাধ কি বলুন, আমি আমার সাধ্যানুসারে শিক্ষা দিবার ত্রুটি করি না, ছেলেরা আদৌ পরিশ্রম করে না।"

শ্রীশচন্দ্র বিরক্তভাবে কহিলেন,"তবে আপনি কি কর্‌তে আছেন? না, দেখ্‌ছি আপনার দ্বারা আর ছেলে মানুষ হ'ল না। আপনি সেদিন বিমলকে ক্যাট (cat) মানে ঘোড়া বলে দিয়েছিলেন?"

বিস্ময়ান্বিতচিত্তে হরেশচন্দ্র কহিলেন, "আমি ব'লে দিয়েছি। হ্যাঁহে বিমল! Cat মানে ঘোড়া?"

বিমল মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কহিল, "না, মশাই! আপনি Cat মানে গাধা বলেছিলেন।"

শ্রীশচন্দ্র মাষ্টারের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, (disgraceful) অতি লজ্জার কথা। না, আপনি আপনার মাহিনা চুকিয়ে নিয়ে যাবেন, আমার অমন বি এ, পাশ করা মাষ্টারের দরকার নাই।"

হরেশচন্দ্র অমল, বিমল ও কমলকৃষ্ণকে লেখাপড়া শিখাইতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন, কিন্তু তাহারা অতিশয় মূর্খ বলিয়া কিছুই শিক্ষা করিতে পারিত না। তাহারা পিতার কাছে মাষ্টার মহাশয়ের উপর দোষারোপ করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিত। আজ হরেশচন্দ্র ছাত্রদিগের

ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে কহিলেন, "বেশ, আপনি অন্য একজন শিক্ষকের অনুসন্ধান করুন, আমি আর এ স্থলে মাষ্টারি করিতে চাহি না।"

শ্রীশচন্দ্র গর্ব্বিতভাবে কহিলেন, "আমিও আপনাকে রাখিতে ইচ্ছা করি না, আপনি সাম্‌নে রবিবারে এসে আপনার প্রাপ্য চুকিয়ে নিয়ে যাবেন।"

হরেশচন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, তিনি আজ জীবনে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেন এমন হইল

এক সময়ে মুখোপাধ্যায় পরিবারের অতুল যশঃসৌরভে কলিকাতার জনসাধারণ বিমুগ্ধ ছিলেন, সে আজ প্রায় আট বৎসরের কথা, যখন শ্রীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিপদ মুখোপাধ্যায় জীবিত ছিলেন, তখন এই মুখোপাধ্যায়-বাটীতে অজস্র লোক সমাগম হইত। পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা কালিপদ নিজে বিনম্রস্বভাবচরিত্রে সকলেরই মনে সন্তোষ-বিধান করিতেন। তিনি স্বয়ং একজন পুলিসকোর্টের প্রোথিতযশা উকীল ছিলেন, তাঁহার পৈত্তিক সম্পত্তি কিছুই ছিল না। তিনি স্বীয় অধ্যবসায়গুণে বিপুল অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ঠাকুর তিনটী পুত্র সন্তান ও একমাত্র কন্যা রাখিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তন্মধ্যে কালিপদ জ্যেষ্ঠ, শ্রীশচন্দ্র মধ্যম ও সুরেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ ছিলেন, কন্যার নাম মহামায়া।

যে সময়ে ইহাদের পিতৃবিয়োগ হয়, তখন মুখোপাধ্যায়-পরিবার বলিয়া কোনও সুখ্যাতি ছিল না, ইহাদের সংসার চলা দায় হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্য ভ্রাতাগণ উপায়ক্ষম ছিলেন না, মহামায়া বালিকামাত্র, ইহাদিগের মাতৃদেবী তখনও বর্ত্তমান ছিলেন। কালিপদ বাবু অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তিনি এই সময়ে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লালবাজার পুলিসকোর্টে সামলা মাথায় দিয়া মামলা মোকদ্দমার কার্য্যে চিত্তনিবেশ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার পসার জমিয়া যায়, এই সুযোগে তিনি সহোদরদ্বয়কে মানুষ করিয়াছিলেন এবং

সময়ে মহামায়ার বিবাহ দেন। কালিপদ বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি একান্নভুক্ত থাকিয়া সহোদরদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার যত্নে ও অর্থব্যয়ে শ্রীশচন্দ্র ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তিনি নিজের সন্নিকটে রাখিয়া অনেক মক্কেল জুটাইয়া দিতেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ তেমন মেধাবী ছিলেন না, প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুইবার ফেল হওয়ায় তিনি পাঠাভ্যাসে ইস্তফা দিয়া কিছুদিন গৃহে বসিয়াছিলেন।

কালিপদ বাবু সুরেন্দ্রের এই প্রকার পাঠে অনিচ্ছা দেখিয়া, নিজের আয় হইতে সঞ্চিত পাঁচ সহস্র মুদ্রা কনিষ্ঠের নামে জমা দিয়া, তাহাকে এক সওদাগরি অফিসে মুৎসদ্দিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র নিজের প্রতিভাবলে পুলিসকোর্টে বড় বেশী পসার জমাইতে পারেন নাই, যে মক্কেল তাঁহাকে কোন একটা মোকদ্দমার ভার দিতেন, তিনি প্রায়ই তাহাতে হারিয়া যাইতেন; এমন অবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই সকল দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। এইরূপে কালিপদ জননীর শ্রীপদে আন্তরিক ভক্তি রাখিয়া দিন দিন উন্নতির সোপানারূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি যখন আদালতে যাইতেন, তখন মাতৃদেবীর পদরেণু গ্রহণ না করিয়া বহির্গত হইতেন না, এবং তিনি আসামী বা ফরিয়াদীর যে পক্ষাবলম্বন করিতেন, তাহাতেই প্রায় জয়ী হইতেন। সুন্দর ভাবে আইন শিক্ষাই ইহার বিশেষ কারণ।

কালিপদ বহু অর্থ উপায় করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, পরের দুঃখ দারিদ্র্য দূরীকরণে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই মুক্ত ছিল। পরোপকার করা তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি কখনও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিতেন না, সংসারের উন্নতিকামনায়, দশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করিতেন।

এইরূপে সংসার-কার্য্য পরিচালনা করিয়া পিতৃবিয়োগের প্রায় পঁচিশ বৎসরের পর তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিবার কিছুদিন পরেই কালীপদ বাবু তিনটী পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

কালিপদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ননীগোপাল, মধ্যম নৃত্যগোপাল, কনিষ্ঠ প্রিয়গোপাল। ননীগোপাল তখন বি, এ পড়িতেছিল, নৃত্যগোপাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ. এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছে, আর প্রিয়গোপাল প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

শ্রীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আনুকূল্যে পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, এমন কি কালিপদ বাবু যদ্যপি নিজের স্বার্থের প্রতি তাকাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন-স্রোত অন্যভাবে প্রবাহিত হইত।

মানুষ স্বার্থের দাস, স্বার্থ লইয়া সকলেই ব্যস্ত। পরের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কয়জন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন? কালিপদ বাবুর মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই শ্রীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ মিলিয়া একান্নভুক্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারের মধ্যে বিষয় ভাগ করিয়া লইলেন। বলাবাহুল্য, আইনবিশারদ শ্রীশচন্দ্র যতদূর সম্ভব সর্ব্বাগ্রে নিজের উদর পূর্ণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বিষয়ের ভাগ দিয়াছিলেন। পিতৃহীন ননী নৃত্য ও প্রিয়গোপাল নগদ টাকা-কড়ি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র সুকৌশলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে উপস্থিত দেনদাররূপে সাধারণ্যে আখ্যাত করিলেন এবং তাঁহার দেনা পরিশোধ করিতে যে, উভয় ভ্রাতা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, একথা সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন।

ননীগোপাল খুল্লতাতদিগের নীচ ব্যবহারে আপত্তি উত্থাপন করায়

তাহার জননী আত্মকলহে লিপ্ত হইতে নিবারণ করেন। জননীর অভিপ্রায়ানুসারে ননীগোপাল সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিল।

ননীগোপালের জননী—ক্ষেমঙ্করী এজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই. তিনি সানন্দচিত্তে দেবরদিগকে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে সৃজিত অট্টালিকার স্বত্ব উপভোগ করিতে দিয়া, নিজের অংশ স্বেচ্ছায় তাঁহাদিগকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ এক্ষণে সেই অট্টালিকার মালিক, আর ননীগোপাল পটলডাঙ্গায় একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লইয়া জননী ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিল। ক্ষেমঙ্করী বাড়ী বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই পুত্রত্রয়কে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখিবার জন্য উপদেশ দেন, পুত্রেরাও প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জননীর দুঃখ দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইল। যদিও ক্ষেমঙ্করী দেবরদিগের বিষয় বণ্টন কার্য্যে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, তথাপি প্রতিবাসীরা শ্রীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে নানারূপ দোষারোপ করিয়া, তাঁহাদিগের নিন্দা করিতে লাগিল। ইহাতে উভয় ভ্রাতাই ক্ষেমঙ্করীর উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আদৌ সাহায্য করেন নাই। পথে ঘাটে মাঠে তাঁহাদিগকে দেখিলেই পাড়ার বালক, বৃদ্ধ, যুবা মাত্রেই গালি দিত এবং ননী, নৃত্য ও প্রিয়গোপালের দুঃখের কথা কহিয়া প্রশংসা করিত।

শ্রীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের ইহা অসহ্য বোধ হইত। পাড়ায় পাড়ায় যাহা শুনিতেন, তাহা আজ হরেশচন্দ্রের মুখে উপদেশচ্ছলে ঘরে শুনিয়া শ্রীশচন্দ্রের গাত্রদাহ হইয়াছিল; ফলে ন্যায়নিষ্ঠ হরেশচন্দ্র চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের মনের মধ্যে, পাড়ার মধ্যে ভয় ও অপকীর্ত্তি কিছুতেই দূরীভূত হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের কথা

শ্রীশচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে ফাঁকি দিয়া দু' পয়সা বেশ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি নিজে প্রথমতঃ সদুপায়ে বড় বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই, প্রতারণা ও নানারূপ বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ করিয়া অনেকের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ আদায় করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের দুই বিবাহ, প্রথম স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম সাতকড়ি।

সাতকড়ির বয়স যখন দুই বৎসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়, সে পিসী-মার যত্নে লালিতপালিত। কালিপদ বাবু শ্রীশচন্দ্রের আবার বিবাহ দেন, দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে উপস্থিত তিনটী পুত্র জন্মিয়াছে—কমল, বিমল ও অমলকৃষ্ণ। সাতকড়ি কালিপদ বাবুর যত্নে পাঠাভ্যাস করিত, তাঁহার প্রথমে পুত্র হয় নাই, তিনি সাতকড়িকে বড় স্নেহ করিতেন; পরে ননীগোপাল প্রভৃতি সন্তান জন্মে।

সাতকড়ি লেখাপড়ায় তত যত্ন করিত না, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল হইবার পর তাহার জীবনস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। কালিপদ সাতকড়ির সহসা এই ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুরেন্দ্রের অধীনে চাকুরি করিয়া দিয়া শৈশবেই তাহার বিবাহ দেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীশচন্দ্র বিষয়বণ্টনে অধর্ম্মাচরণ করিলে সাতকড়ি এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে, ইহাতে শ্রীশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া পুত্রকে যৎপরোনাস্তি অপমান করেন, এবং ত্যাজ্যপুত্র করিব বলিয়া ভয় দেখান।

মনের দুঃখে সাতকড়ি বালিকা পত্নী রাখিয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক উদাসীন হয়। এই ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, সাতকড়ির কোন সন্ধান নাই। শ্রীশচন্দ্র সে পুত্রবধূকে নিজ গৃহেই রাখিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী কিরণশশী তাহার দ্বারা সংসারের সকল কার্য্যই করাইয়া লইত। সাতকড়ির পত্নী ফুলকুমারী কিরণের সদা-সর্ব্বদা আজ্ঞাপালন ও সেবাশুশ্রূষা করিয়াও মন পাইত না; শ্রীশচন্দ্র আদালতে মামলা বাজাইয়া ক্লান্তকলেবরে গৃহে আসিয়া কিরণের কক্ষে উপনীত হইলেই, সে ফুলকুমারীর নামে অযথাভাবে অনেক দোষারোপ করিত।

সুরেন্দ্রনাথ মুৎসর্দ্দিগিরি করিয়া দু' পয়সা বেশ আয় করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠের আনুকূল্যে তিনি একেবারে পাঁচ হাজার টাকার মালিক। এ অর্থের অধিকারী তিনি একাই; কালিপদ বাবু যে স্বয়ং অর্থ দিয়া কনিষ্ঠের কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা তিনি কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই, কনিষ্ঠের কল্যাণকামনাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল।

কালিপদ বাবুর মৃত্যুর পর এই টাকার কথা উঠিলে সুরেন্দ্রনাথ অম্লানবদনে প্রকাশ করিলেন যে, "দাদা, আমার পক্ষে পাঁচ হাজার টাকার জামিন ছিলেন, পরে আমিই এই টাকা জোগাড় করিয়া অফিসে জমা দিয়াছি।" যাহা হউক, সুরেন্দ্রের এ কথায় কেহ প্রত্যয় করিত না, ননীগোপালকে পাড়ায় কেহ কেহ এ টাকার কথা বলিত, সে নিজের লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিত, এ কথায় তত কান দিত না, কেন না ক্ষেমঙ্করী কাহারও সহিত বাদবিসম্বাদে লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন না। তিনি ভাবিতেন, জগতে পরকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্য যে করে, সে নিজেই ফাঁকে পড়ে।

সুরেন্দ্রনাথের দুই কন্যা, দুইটীই বিবাহিতা। কনিষ্ঠা কন্যা যোগ-

মায়ার অদৃষ্ট বড় মন্দ, বিবাহের এক বৎসরের পর তাহার স্বামী নিউ-মোনিয়া রোগে দেহত্যাগ করে, ইহার পর হইতে যোগমায়া পিতৃ ভবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাহার শ্বশুরালয়ে তাহাকে অলক্ষণা মেয়ে বলিয়া গৃহকোণে স্থান দেয় নাই।

জ্যেষ্ঠ কন্যা অনুপমার ভাল ঘরে বিবাহ দিয়াও সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সুখী করিতে পারেন নাই। মোটের উপর শ্রীশ ও সুরেন্দ্র উপস্থিত আর্থিক অবস্থায় বিশেষ উন্নত হইলেও মানসিক কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; শ্রীশচন্দ্র পুত্র ও সুরেন্দ্রনাথ কন্যাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা জ্বালাতন হইতেন।

ননী, নৃত্য ও প্রিয়গোপাল পঠদ্দশায় ছেলে পড়াইয়া নিজেদের সংসারযাত্রা ও পাঠাভ্যাস যত্নসহকারে নির্ব্বাহ করিতেছিল, কালিপদ বাবু জীবদ্দশায় ঐকান্তিক যত্নে যে পরিবারকে একান্নভুক্ত রাখিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সেই পরিবার তিন ঘরে বিভক্তিভূত হইয়াছিল। এই তিন ঘরের সন্তানসন্ততিগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার এক পিসী-মা ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। পিসী-মা শত চেষ্টা করিয়াও, শ্রীশ ও সুরেন্দ্রনাথকে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিতে পারে নাই; কেন, তাহাই বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিসী-মা

মহামায়া কালিপদ বাবুর একমাত্র ভগ্নী, তিনি তাহাকে অতি শৈশবকাল হইতে লালনপালন করিয়া সময়ে বিবাহ দেন। কিন্তু দুর-দৃষ্টক্রমে মহামায়ার বিবাহের তিন বৎসরের পর তাহার স্বামী লোকান্তরিত হন। তাঁহার সংসারে কেহ অভিভাবক ছিল না; কালিপদ এক উপার্জ্জনশীল ডাক্তার কৃষ্ণকমলের সহিত মহামায়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল ইতিপূর্ব্বে একবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কোনও সন্তানাদি হইবার পূর্ব্বেই সেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তৎপরে কৃষ্ণকমলের মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি প্রিয়বন্ধু কালিপদ বাবুর অনুরোধে মহামায়াকে বিবাহ করেন। মহামায়া সুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণা হইলেও স্বামী-সম্মিলন-সুখ বেশী দিন উপভোগ করিতে পারে নাই। বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে সে বিধবা হয়, এবং সেই অবধি মহামায়া স্বামীর যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংসারে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিল।

কালিপদ বাবুর স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী মহামায়াকে স্বহস্তে লালনপালন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার দুঃখে কাতরা হইয়া তাহাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। মহামায়া ভ্রাতাগণের সন্তানসন্ততীদিগকে স্বীয় পুত্র কন্যার ন্যায় মানুষ করিত। একান্নভুক্ত সংসারে তাহার অতুল প্রতাপ; ছেলেরাও পিসী-মা বলিতে অজ্ঞান হইত। মহামায়া পরোপকারে সদাই ব্যস্ত থাকিত, দানে তাহার হস্ত সর্ব্বদাই মুক্ত ছিল।

পাড়াপ্রতিবাসীরা সকলেই মহামায়ার সেবা, যত্ন ও সাহায্যে পরিতুষ্ট ছিল। কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, শ্রীশচন্দ্র মহামায়ার অধিকতর তোষামোদ করিয়া, তাহাকে নিজ সংসারে রাখিয়া তাহার টাকাগুলি সুকৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছেন। মহামায়া এ বিষয় অবগত হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে একদিন সঞ্চিত টাকার কথা বলে, তাহাতে তাঁহার সহিত মহামায়ার বচসা হয়, ফলে শ্রীশচন্দ্র অনাথা ভগ্নীকে যৎপরোনাস্তি অপমান করেন এবং নানারূপ কারণ দর্শাইয়া টাকার ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। অভিমানে, লজ্জায় মহামায়া শ্রীশচন্দ্রের সংসার ত্যাগ করিয়া, ক্ষেমঙ্করীর নিকটে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমলতা অনেক অনুনয় ও বিনয়সহকারে মহামায়াকে নিজ সংসারে টানিয়া লইয়াছিল।

মহামায়া ক্ষেমঙ্করীকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, তাঁহার এ দুর্দ্দিনে মহামায়া আর ক্ষেমঙ্করীর গলগ্রহ হইয়া, তথায় যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া হেমলতার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিল; সেই অবধি মহামায়া সুরেন্দ্রের সংসারেই আছে। একদিন শ্রীশচন্দ্র মহামায়ার বিষয়ৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার তোষামোদ করিয়াছিলেন, আজ সুরেন্দ্রনাথ মহামায়ার নিকটে কায়িক পরিশ্রম পাইবার আশায় তাহার তোষামোদ করিতে এত ব্যস্ত।

ক্ষেমঙ্করী—মহামায়া যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহাতেই তাঁহার সুখ। তিনি দুঃখদারিদ্র্যে পড়িয়াও উপযুক্ত পুত্রের সেবায় কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই।

হেমলতা ও মহামায়া পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিত, সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা যোগমায়া বিধবা হইয়া অবধি পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছে। মহামায়া তাহার প্রাণে প্রাণে ধর্ম্মের মধুর ভাব জাগাইয়া,

পতিবিরহের কোন জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করিবার সুযোগ দিত না। সর্ব্বদাই তাহাকে নিজের কাছে কাছে রাখিত, রামায়ণে সীতাদেবী রামচন্দ্রের বিরহে অশোক তরুতলে চেড়িগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া, কি ভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইত, মহাভারত পড়াইত, গৃহকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে সকল কাজ-কর্ম্ম শিখাইত। মহামায়া যেমন নিজে বিধবার পালনীয় বারব্রত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিত, সেইরূপ যোগ-মায়াকেও করাইত।

যোগমায়ার বয়স চৌদ্দ বৎসরমাত্র, বার বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার বিবাহ দেন, এক বৎসর পরেই সে বিধবা হয়। যোগমায়া পিসী-মার যত্নে, আগ্রহে কোন কষ্ট অনুভব করিত না। শিষ্যার ন্যায়, কন্যার ন্যায় পিসী-মার আজ্ঞাপালনের জন্য সতত প্রস্তুত থাকিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিরণশশী

শ্রীশচন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপে হরেশচন্দ্রকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পুত্রত্রয়কে অনেক তিরস্কার করিলেন, এবং ভবিষ্যতে যিনি তাহাদিগের শিক্ষক হইবেন, তাঁহার নিকটে যেন সকলে অধিকতর আগ্রহসহকারে পাঠাভ্যাস করে, সেজন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন। পুত্রেরা উপস্থিত দু' একদিন যে মাষ্টার মহাশয়ের অভাবে স্কুল কামাই করিতে পারিবে, সেজন্য আহ্লাদে আটখানা হইল এবং হরেশচন্দ্র তাহাদিগকে শিক্ষাদানে অলসতা করিত, এইরূপ অনেক কথা পিতৃপাশে জ্ঞাপন করিল।

শ্রীশচন্দ্র সে সকল শুনিয়া বৈঠকখানা বন্ধ করাইয়া শয়নকক্ষে গেলেন। তথায় বেহারা তামাক দিয়া আসিল, তিনি কিছুক্ষণ তামাক সেবনের পর নিজের একখানি মোকদ্দমার কাগজ লইয়া মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে কিরণশশী একটি পানের ডিবা হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া, ধীরে ধীরে মাথার চুল ধরিয়া টানিল।

শ্রীশচন্দ্র বিরক্ত অথচ সহাস্যমুখে কহিলেন, "অ্যাঁ! সব মাটি হ'ল, আমার মাথাটা গুলিয়ে দিলে; বোধ হয়, এ মোকদ্দমায় আমি জিতিতে পারিব না।"

শুনিয়া কিরণশশী সহাস্যে বলিল, "বলি, তোমার কি কাগজ নাড়াচাড়া সব সময়েই? নাও—রাত হয়েছে, ও সব রেখে দুটো সংসারের কথা শোন।"

শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "কি বল না, আবার মহামায়া কিছু বলেছে নাকি ?"

কিরণশশী কহিল, "তারই কথা ত বল্‌ছি, তোমায় সেদিন বলেছিলেম যে, ওদের ছাতের সঙ্গে আমাদের কোন সংসর্গ রেখো না, ওরা যাতে না এদিক্ মাড়াতে পারে, তার ব্যবস্থা কর, তা তুমি ত আর শুনবে না। আমিই এখন জ্ব'লে পুড়ে মর্‌ছি।"

শ্রীশ। কি হয়েছে বলই না।

কিরণ। বলে আর কি কর্‌ব ? তোমার কি বিশ্বাস হবে ?

শ্রীশ। কেন ? আমি কখনও কি তোমার কথায় অবিশ্বাস করেছি ? কে কি করেছে ?

কিরণ। কে যে করেছে, তা বল্‌তে পারি না, আজ আমি ছাদে আমার নতুন ডুরে সাড়ীখানা শুকাতে দিয়েছিলেম, তা আর আস্ত রাখেনি, একেবারে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছে।

শ্রীশ। কে, মহামায়া ?

কিরণশশী একটু নাকিসুরে কহিল, "তা কি করে বল্‌ব বল, চোখে না দেখে ত আর বল্‌তে পারি না, এখন আমার জিনিষটা ত গেল।"

শ্রীশ। একদিন পাহারা দিয়ে ধর না।

কিরণ। ধর্‌ব আর কি ? এ কাজ হয় ঠাকুরঝী করেছে, আর নয় তার সাক্‌রেধ যোগমায়া ; আমাদের ঘরের ঢেঁকিটিও কম যান না।

শ্রীশ। কে, বৌ-মা ?

কিরণ। হ্যাঁগো হাঁ, তাঁর ত ঠাকুর-ঝীর কাছে না হ'লে এক দণ্ড চলে না, কেবলই ওর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে পরামর্শ আঁটছে, আমি এত ক'রে ঠাকুরঝীর কাছে থাক্‌তে বারণ করি, তা আমার কথা কি শোনে ?

শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "আচ্ছা, আমি কাল বৌ-মাকে বল্‌ব, ফের

যদি ও বাড়ীতে যায়, তা হ'লে আর এখানে রাখ্‌ব না, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। আর শীঘ্রই আমি ছাদের দিকে একটা আল্‌সে তুলে দিব। সেতোটা যে কোথায় চলে গেল, তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ বৎসর কেটে গেল, সে মল কি বাঁচ্‌ল, তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সেতো মহামায়ার হাতে মানুষ হয়েছিল, আমি মহামায়াকে সংসার হতে বিদায় দিলে সে আমার অবাধ্য হয়, মুখের উপর তর্ক করে—তাতে তাকে তিরস্কার করেছিলেম বলে, অভিমানে আমার বাড়ী ছাড়া হয়েছে। বৌ-মাকে দেখ্‌লে সেতোর কথা আমার মনে জেগে উঠে। সে থাক্‌লে তবু আমার একটা ভরসা থাক্‌ত, কুক্ষণে আমি তাকে তিরস্কার করেছিলেম, কুক্ষণে মহামায়ার বিষয় হস্তগত করেছি। তার অভিশাপেই বোধ হয়, আমি সেতোকে হারালেম।" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীশচন্দ্র পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। কিরণশশী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কহিল, "নাও, আর ভেবে কি করবে বল। ঠাকুরঝীর তুমি এমন কি নিয়েছ যে, সে তোমায় অভিশাপ দেবে ?"

শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "কিরণ! তুমি জান না, দাদার আমলে আমাদের সংসারে মহামায়ার কি আধিপত্য ছিল, তুমি যখন এ সংসারে এস, তখন সেতোর বয়স সাত বৎসর, সে শৈশবে মাতৃহারা হয়, মহামায়া তাহাকে মানুষ করেছিল, সে পিসী-মা ছাড়া আর কাউকে জান্‌ত না ; দাদা বড় আদরে মহামায়াকে সংসারে রেখেছিলেন, তার প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ছিল, দাদার মৃত্যুর পর আমি নিতান্ত দায়ে পড়ে মহামায়ার সে সব টাকা নিয়েছিলেম, আর দিতে পারি নাই। কাজেই মহামায়া সে টাকা চাইলে আমি তার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করি, ফলে সে এ সংসার ত্যাগ করেছে। আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

হয়েছি, বড় বৌকে এ বাড়ী ত্যাগ করিয়েছি। ছোট বৌ-মা মহামায়ার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের সংসারে টেনে নিয়েছে।"

কিরণশশী কহিল, "নিক্‌গে, তুমি আমার অমল, বিমল ও কমলকে লেখাপড়া শেখাও, এরা বেঁচে থাক্‌লে তোমার ভাবনা কি।"

শ্রীশ। আমি ওদের লেখাপড়া শেখাব বলে চেষ্টার ত্রুটি কর্‌ছি না, কিন্তু ওরা শেখে কৈ!

কিরণ। তুমি সে মাষ্টারকে জবাব দিয়ে ভাল কাজ করেছ, সে কেবলই যেন আমাদের ঠেস্ দিয়ে সংসারের কথা শোনাত। এবার ভাল মাষ্টার আন্‌বার ব্যবস্থা কর। লেখাপড়া শিখ্‌বে বৈকি, আমার ছেলেরা ত আর নেহাত হাঁদা নয়! মাষ্টারে যা শেখায়—তাই শেখে।

শ্রীশ। ছাই শেখে! ছেলেগুলো একেবারে মূর্খ, নৈলে বি, এ পাশ করা মাষ্টার কখনও কি Cat (ক্যাট) মানে গাধা শিখিয়েছে?

কিরণ। তা আর আশ্চর্য্য কি! এবার আরও ভাল মাষ্টার আন, বেশ লেখাপড়া শিখ্‌বে। এই ঠাকুরঝীর কাছে বৌ-মা আমার কাপড় ছিঁড়ে দিতে শিখেছে—এখন রোজই তাই কর্‌ছে।

শ্রীশ। না—না—ঠাকুরঝী তোমার কেন কাপড় ছিঁড়ে দিতে শেখাবে?

কিরণ। তবে সে বৌ-মাকে এত কি কথা বলে—বৌ-মা সেখানে যায় কেন?

শ্রীশ। আচ্ছা, আমি বারণ কর্‌ব। এস এখন খাবার দেবে—বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

কিরণ। চল—খেয়ে, ছাদে আলসে তোল্‌বার মতলব ঠিক কর্‌তে হবে।

শ্রীশ। তা কর্‌ব—সেজন্য ভাবনা কি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপদে বন্ধু

হরেশচন্দ্র কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। শ্রীশচন্দ্রের প্রদত্ত কুড়ি টাকাতেই উপস্থিত তিনি অতি কষ্টে সংসার চালাইতেছিলেন, এক্ষণে তাহা হারাইয়া হৃদয়সাগরের অবিরাম ভাবনা-তরঙ্গাভিঘাতে একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। হরেশচন্দ্র বাড়ীতে এ সকল ঘটনার কিছুই উল্লেখ করিলেন না, কিন্তু সে রাত্রে তিনি ভালরূপ আহার, নিদ্রা করিতে পারেন নাই; কি প্রকারে সংসার চালাইবেন, কি করিলে আবার একটি কর্ম্ম জুটিবে, কেনই বা শ্রীশ-চন্দ্রের সহিত তর্ক বিতর্ক করিলেন, এই সকল ভাবনায় সারা রাত্রি কাটিল। যখন তন্দ্রা আসে, তখনই যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে শ্রীশ-চন্দ্রকে দেখিতে পান; এইরূপে অতি কষ্টে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই হরেশচন্দ্র চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইলেন। তিনি ব্যয়সঙ্কোচ করিবার জন্য লোয়ার সার্কুলার রোডের অন্তর্গত বেনে-পুকুর লেনে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন, এই স্থান হইতে বালিগঞ্জে শ্রীশচন্দ্রের বাটীতে যাওয়া-আসা করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত না। আজ প্রভাতোদয়ে তিনি এই স্থান হইতে বেলিয়াঘাটাভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার সহিত জীবনচন্দ্র নামক এক যুবকের সাক্ষাৎ হইল।

জীবনচন্দ্র অত্যন্ত অমায়িক লোক, ইঁহারা উভয়েই এক ক্ল্যাসে পাঠাভ্যাস করিতেন, জীবনের পাঠে তেমন যত্ন ছিল না, এণ্ট্রান্স

পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করেন, হরেশচন্দ্র নিজ প্রতিভাবলে বি, এ পাশ করিয়াছেন। জীবনের বাটী বালিগঞ্জে, তাঁহার সহিত শ্রীশচন্দ্রের সদ্ভাব ছিল, হরেশচন্দ্রের শেষ চাকুরীটী জীবনই করিয়া দিয়াছিলেন। জীবনের বয়স অন্যূন চল্লিশ বৎসর হইবে। তিনি দার-পরিগ্রহ করেন নাই, পিতার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। ইঁহারা দুই ভাই। জীবন কনিষ্ঠ, বরেণ জ্যেষ্ঠ। এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রেঙ্গুনে ওকালতী করিয়া দু' পয়সা বেশ সংস্থান করিয়াছিলেন; জীবনচন্দ্র পৈত্রিক যাহা কিছু সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই এক প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। জীবনের মাতা জীবিতা আছেন, তিনি তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন। এই জীবনচন্দ্রকে সহসা পথিমধ্যে দেখিয়া হরেশচন্দ্র কহিলেন, "আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে, বহুদিনের পর আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'ল। কেমন, ভাল আছ ?"

জীবনচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, "মন্দ কি, এক রকমে বেশ দিন চলে যাচ্ছে। তুমি কেমন ?"

হরে। আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করো না, ভাই! কষ্টের এক শেষ, এখন দিন চলা দায়।

জীবন। কেন, সে ছেলে পড়ান ছেড়ে দিয়েছ নাকি ?

হরে। আমি ছাড়িনি, শ্রীশ বাবু আমায় ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আর ভাই! সে চাকুরী গিয়েছে, তাতে আমি দুঃখিত নই; এত করে পরিশ্রম করতেম, তাতেও ছেলেগুলো কিছু করত না, বদ্‌নাম হ'ত আমার। বলে কি জান ভাই! আমি ছেলেদের Cat মানে গাধা বলে দিয়েছি। আর গুণধর শ্রীশচন্দ্রও ছেলেদের কথা শুনে আমার লাঞ্ছনার এক শেষ করলেন।

জীবন। বটে, তা যাক; সেটা নেহাত গোঁয়ার। হঠাৎ বাবু কিনা, ভাইপোকে ফাঁকি দিয়ে, অনাথা ভগ্নীকে ঠকিয়ে বিষয় করেছে, ও আর ক'দিন যাবে! দেখ না, হাতে হাতে অভিশাপের ফল পেয়েছে, অমন উপযুক্ত ছেলে কোথায় বিবাগী হয়ে চলে গেল। তা তুমি এখন কি কর্‌বে, মনে করেছ?

হরে। কি আর করব ভাই! চাকুরী ভিন্ন ত আর উপায় দেখ্‌ছি না, একটি চাকুরীর সন্ধানে যাচ্ছিলেম, তোমায়ও বলা রইল—একটা কাজের চেষ্টা দেখো।

জীবন। দেখ্‌ব বৈকি! আমার মেসো মশাই একটা স্কুলের হেড মাষ্টার হয়েছেন। তাঁকে ধরে তোমার একটা কাজ করে দেবো।

হরে। সেটা কোন্ জায়গা?

জীবন। আন্দুলে—জায়গা ভাল।

হরে। অনেক দূর, তা হোক, তুমি চেষ্টা দেখো। চাকুরী হয়, সেইখানেই বাসা কর্‌ব।

জীবন। আচ্ছা, তুমি একবার ননীগোপালের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার? সে এখন বি, এল পড়্‌ছে, অনেক লোকের সঙ্গে তার আলাপ, সে মনে করলে তোমার একটা ছেলে পড়ান জুটিয়ে দিতে পারে।

ইহা শুনিয়া হরেশ্চন্দ্র কহিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমার তেমন আলাপ নাই, তাঁর এই দুঃখের সময়ে আর বিরক্ত করে কাজ নাই।"

জীবনচন্দ্র কহিলেন, "নাহে, সে খুব ভাল লোক, আমায় বড় মান্য করে। আমি তোমায় তার কাছে নিয়ে যাই এস, সে চাকুরী করে দিতে পারে ভাল, না হয়—মেসো মশাইয়ের কাছে হবেই হবে।"

"চল, তোমার উপকার আমি জীবনে ভুল্‌ব না।" এই বলিয়া হরেশ্চন্দ্র জীবনের সহিত ননীগোপালের নিকট গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিচার মাহাত্ম্য

সুরেন্দ্রনাথ আজ-কাল বালিগঞ্জের মধ্যে একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হইয়াছেন, তাঁহার বৈঠকখানায় প্রত্যহ প্রাতে নয়টা ও সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত মজলিস হইয়া থাকে। অনেক তোষা-মোদী সুরেন্দ্রনাথের মন যোগাইয়া কেহ চা, কেহ তামাক, কেহ পান খাইবার জন্য এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। আজ প্রভাতে এ স্থলে হরলাল ও কান্তিচরণের সমাগম হইয়াছে; সুরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের তোষামোদে গর্ব্বিত হৃদয়ে বসিয়া আল্‌বোলার নল মুখে দিয়া ধূম পান করিতেছেন, এমন সময়ে হরলাল কহিল, "বাঃ, কি চমৎকার তামাক!"

কান্তিচরণ কহিল, "চমৎকার!"

শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তোমরা এ তামাক খেয়েছ নাকি?"

হরলাল কহিল, "আজ্ঞে, রোজই ত খাচ্ছি।"

কান্তিচরণ বলিল, "ওর গন্ধেই মালুম হচ্ছে।"

সুরেন্দ্রনাথ আলবোলা হইতে কলিকা খুলিয়া হরলালের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, একবার টেনে দেখ।"

সাগ্রহে কলিকা লইয়া হরলাল হুকায় টান দিতে দিতে বলিল, "চমৎকার তামাক বাবু, এক টানেই মালুম হয়।"

কান্তিচরণ অঙ্গভঙ্গি করিয়া কহিল, "গন্ধে বিভোর আর কি!"

সুরেন্দ্রনাথ যখন তাহাদের হস্তে কলিকা প্রদান করিয়াছিলেন, তখন বাস্তবিক তাহাতে ধূমপান করিবার মত তামাক আগুন আদৌ

ছিল না, সমস্তই ছাই হইয়াছিল, তোষামোদীদ্বয় তাহা টানিয়াই সেই তামাকের এত গুণ গাহিতেছিল। হরলাল যখন পুনরায় হুকায় টান দিয়াও ধূম বাহির করিতে পারিল না, তখন কান্তিচরণকে সেই হুকা প্রদান করিল।

কান্তিচরণ পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল যে, সে কলিকায় কোন পদার্থ নাই, তথাপি সে সুরেন্দ্রের মন যোগাইবার জন্য তাহাতে টান দিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া সহাস্যে কহিলেন, "কি, কিছু নাই বুঝি ?"

হর। বোধ হয় নাই।

সুরেন্দ্র। না, ওতে অনেক তামাক টিকে ছিল—বোধ হয় ধরেনি।

"আজ্ঞে, তাই হবে, আমরা ধরাতে পারিনি, আমি দেখ্‌ছি।" এই বলিয়া কান্তিচরণ যেমন কলিকা নামাইয়া ফুঁ দিয়াছে, অমনই ছাইগুলি তাহার চক্ষের ভিতরে গিয়া পড়িল।

দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এ্যাঁ! তোমরা পোড়া কলিকাতেই টান দিতেছিলে, বল্‌তে হয়।"

হরলাল কহিল, "তাই ত পুড়ে গিয়েছে, বল্‌তে হয়।"

কান্তিচরণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল, "আমি মনে করেছিলেম, এ তামাক বুঝি এই ভাবেই খাবার নিয়ম।"

সুরেন্দ্রনাথ যখন এইরূপ ধূম পানে রত ছিলেন, এমন সময়ে তথায় একটি দশম বর্ষীয় বালক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া হরলাল কহিল, "আরে গোব্‌রা যে, কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন ?"

বালকের নাম গোবর্দ্ধন, তাহাকে পাড়ার লোকে গোব্‌রা বলিয়া ডাকিত। সে কাহারও কথার উত্তর না দিয়া অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি হয়েছে, গোবৰ্দ্ধন ?"

গোবৰ্দ্ধন কান্নার সুর সপ্তমে চড়াইয়া কহিল, "আজ্ঞা, এই দেখুন—আপনাদের বটুলাল আমার কাণে কাম্‌ড়ে দিয়েছে।"

হরলাল কহিল, "মিথ্যা কথা, তুই থাম্‌; কাঁদ্‌তে হবে না।"

গোবৰ্দ্ধন আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "থাম্‌ব কি মশাই, দেখুন না—রক্ত পড়্‌ছে।"

কান্তিচরণ তাহার ক্রন্দনে বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুই থাম বাবু! অত চীৎকার করে কাঁদিস্‌ না, তোর শক্ত কাণ কাম্‌ড়ে বটুলালের বোধ হয়, দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে।"

গোবৰ্দ্ধন পূৰ্ব্ববৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ছোট বাবু, আপনি একটা বিচার করুন, বটু আমায় রোজ রোজ মারে।"

শুনিয়া হরলাল কহিল, "তোর মিছা কথা, থাম্‌—থাম্‌—আর জ্বালাতে হবে না।"

গোবৰ্দ্ধন আরও কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "না মশাই, সত্য কথা। দেখুন না, এখনও কাণ দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে।"

কান্তিচরণ কহিল, "ও সব ন্যাকামি রাখ—আমরা সব বুঝি।"

গোবৰ্দ্ধন পূৰ্ব্ববৎ কাঁদিতে লাগিল। হরলাল ও কান্তিচরণ বালকের কষ্টে সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া আপনাপন স্বভাবসিদ্ধগুণে সুরেন্দ্রনাথের তোষামোদ করিতে লাগিল, এবং বটুলাল যে বড় সুবোধ ছেলে তাহা বার বার কহিল।

সুরেন্দ্রনাথ বটুলালকে বিলক্ষণ জানিতেন, সে বাল্যকাল হইতে মাতৃহীন হইয়া সুরেন্দ্রের স্ত্রীর অনুযোগে এ বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছে; বটুলাল সুরেন্দ্রনাথের শালীর পুত্র; সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ছিল না। তাঁহার স্ত্রী জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অনুরোধে বটুলালের লালনপালনের ভার

গ্রহণ করিয়াছিলেন। বটুলালের পিতার পল্লীগ্রামে বাস, তিনি পত্নী-শোকে কাতর হইয়া কিছুদিনের পর ইহলীলা সম্বরণ করেন। বটুলাল কলিকাতায় আসিয়া সুরেন্দ্রের অনুগ্রহে বেশ সুখে আছে। সুরেন্দ্র-নাথ তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু বটু-লালের তাহাতে মন ছিল না, খেলায় ও পাড়ার ছেলেদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করিতে সে বেশ পটু ছিল; তাহারই ফলে বটুলাল আজ গোবর্দ্ধনের কাণে কামড় দিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ গোবর্দ্ধনের সেইরূপ কাতর ক্রন্দনে বটুলালের উপর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বটুর জ্বালায় আমাকে জ্বালাতন হতে হ'ল। তুমি বাড়ী যাও, আমার অফিসের বেলা হয়েছে, ওবেলা এসে বোটেকে শাসন কর্‌ব।"

গোবর্দ্ধন কাঁদিতে কাঁদিতে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

কান্তিচরণ কহিল, "ওর মিছা কথা বাবু! মিছা কথা।"

হরলাল কহিল, "আহা! সে কি ওর কাণে কামড় দিতে পারে?"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "সেটা দেখ্‌ছি, দিন দিন বড় বাড়াবাড়ি করে তুল্‌ছে, পাড়ায় লোকে আমার মুখ চেয়ে কিছু বলে না; রোজ একটা-না-একটা ঝগ্‌ড়া তার আছেই আছে।"

হরলাল একটু বিস্মিতের ভাণ করিয়া কহিল, "বটে, বটে।"

কান্তিচরণ কহিল, "তবে তাকে শাসন করুন বাবু! শাসন করুন।"

"ও বেলা এ বিষয়ে দেখ্‌ব," বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যোগমায়া

"পিসী-মা! আজ আমার বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে, জিভ কেবলই শুকিয়ে আসছে, আমি অনেকদিন হতে একাদশী কর্‌ছি, এমন ত কখনও হয় নাই।"

বৈশাখ মাস, বেলা দুইটা বাজিয়াছে, সূর্য্যদেব আপনার তেজোরাশি বিস্তার করিয়া ধরিত্রীবক্ষে পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, পথে, ঘাটে, মাঠে বড়-একটা লোকের চলাচল নাই, সকলেই শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ান্বেষণে ব্যস্ত। এমন সময়ে একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বিধবা বালিকা দালানের সম্মুখস্থ এক তুলসী মঞ্চের সিঁড়ীতে অবস্থিতা মহামায়ার সমীপে আসিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিল।

বালিকার নাম যোগমায়া, সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা।

মহামায়া বালিকার কথা শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "চুপ ক'রে শুয়ে থাকগে মা! আজ আর রোদে বেড়িয়ো না। বৈশাখ মাস, আজ-কাল উপবাসে এইরকম কষ্ট হয়ে থাকে।"

যোগমায়া কহিল, "হাঁ পিসী-মা! এ সব উপবাস কর্‌লে কি হয়—বাঁড়ুয্যেদের বিন্দু ত একাদশী করে না? তার মা বলে, বড় হয়ে কর্‌বে।"

মহামায়া কহিল, "মা! অপরে কি করে-না-করে, সে দেখ্‌বার আমাদের দরকার কি বল। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ করি এস,

পূর্ব্বজন্মের না জানি কি মহাদুষ্কর্ম্মের ফলে আমরা বিধবা হয়েছি, এখন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মে সর্ব্বদাই চিত্তনিবেশ করা উচিত। বিলাস, বসন, ভূষণ এখন আমাদের বিষ তুল্য; আমি যখন তোমার মত বালিকা, বড়-বৌ দিদি এ সব আমায় শিখিয়েছিল। উপবাস করলে আমাদের মন পবিত্র থাকে, বিধবা আমরা—আমাদের চিত্তশুদ্ধি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।”

ইহা শুনিয়া যোগমায়া কহিল, “তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব। তুমি যখন দিনান্তে একবার আহার কর, আমারও মনে হয়, পিসী-মা! তোমার মত এক বেলা খেয়ে থাকি, তুমি যদি বল, তা হলে মা আমায় আর রাত্রে খেতে দেবে না।”

মহামায়া কহিল, “ক্রমে হবে মা! একেবারে সব সহ্য হয় না, আমিও ক্রমে ক্রমে সহ্য করেছি—অভ্যাস কর, তোমারও কোন কষ্ট হবে না। ভেবে দেখ, সামান্য চাতকিণী বৃষ্টির জল পানের জন্য কতদিন আকুল প্রাণে মেঘের দিকে চেয়ে থাকে, প্রশান্ত পারাবার তাহার চক্ষের সম্মুখে রয়েছে, তবুও তার প্রতি সে ভ্রূক্ষেপ করে না, ফটিক জল, ফটিক জল বলে প্রাণের পিপাসা দমন করে। বিধাতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব আমরা, চাতকিণী অপেক্ষা আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য কত অধিক। এস, আমরাও তাহাদের মত স্বার্থ পারাবারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করি।”

যোগমায়া পিসী-মার কাছে বসিয়া উপদেশ শুনিতে শুনিতে অবসন্নচিত্তে সহসা তাহার ক্রোড়ে মস্তকস্থাপন করিল, পিপাসায় তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল; মহামায়া বালিকার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভগবানের উদ্দেশে কহিল, “হা ঈশ্বর! কি পাপে তুমি এই কুসুমকোরক তুল্য বালিকাকে পতিহীনা

করিলে? প্রভো! মুখ রাখ! উপবাসক্লিষ্টা বালিকাকে আজ রক্ষা কর, আমরা যে তোমার পবিত্র নামের আশ্রয় লইয়াছি। আজ তোমার এ কিসের ছলনা দেব?" এই বলিয়া সে যোগমায়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, সে মূর্চ্ছা গিয়াছে, দারুণ পিপাসায় তাহার বাক্যস্ফূরণ নাই। অতঃপর সে কাতরভাবে যোগমায়ার গায়ে হাত দিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "ছোট বৌ, ছোট বৌ, শীঘ্র এস।"

হেমলতা পার্শ্বের গৃহে বসিয়া দুই-একটি প্রতিবেশিনীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, মহামায়ার ডাক শুনিয়া সে শশব্যস্তে তথায় ছুটিয়া আসিল, মহামায়া ইঙ্গিতে তাহাকে যোগমায়ার মুখে জলসেচন করিতে বলিল, হেমলতা তাহাই করিতে লাগিল। এদিকে প্রতিবেশিনীরা হেমলতার দেরী দেখিয়া সকলেই দালানে তাহার সন্ধানে আসিল, এবং যোগমায়ার অবস্থা দেখিয়া তাহারা পরস্পরে নানারূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কহিল, "আহা, এই কচি বয়েস, এখনই কি উপবাস করা সাজে? হলেই বা বিধবা, পাঁচ রকম খেতে পরতে দোষ কি?"

কেহ কহিল, "উপবাস, একাদশী এ বয়সে কেন, বড় হলে না হয় করত।"

এইরূপ এক-একজন এক এক রকম কথা কহিতে লাগিল, মহামায়া তাহাদিগের কথায় বিরক্ত হইয়া যোগমায়ার জন্য কাহাকেও জল আনিতে, কাহাকেও পাখার বাতাস করিতে বলিল, ইহা শুনিয়া তাহারা এক-একটা ওজর দেখাইয়া আপনাপন বাড়ীতে প্রস্থান করিল।

মহামায়া বুঝিয়াছিল যে, যাহারা পরের কথা লইয়া বেশী আন্দোলন করে, তাহাদিগের নিজের কার্য্য করিবার চেষ্টা আদৌ থাকে না, এইজন্য প্রতিবেশিনীগণকে সে স্থান ত্যাগ করিতে না বলিয়া পূর্ব্বোক্ত

রূপ আদেশ করিয়াছিল, ফলে মহামায়ার বাসনা পূর্ণ হইল। হেমলতা যোগমায়ার মুখে ও চোখে কিছুক্ষণ জল সেচনের পর তাহার চৈতন্য হইল, সে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া কহিল, "থাক্ মা! তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না।"

মহামায়া কহিল, "চুপ্ কর, আজ আর বেশী কথা কয়ে কাজ নাই। ঘরে গিয়ে মাদুরের উপর শোওগে, আমি আহ্নিক শেষ ক'রে গিয়ে রামায়ণ পড়্ব।"

ইহা শুনিয়া হেমলতা কহিল, "এখনও আহ্নিক হয়নি, বেলা যে তিনটে বেজে গিয়েছে।"

মহামায়া বলিল, "তা যাক্, আজ আর ত খাওয়া-দাওয়া নাই, আমি একবার বোসেদের মেজ বৌএর হাত দেখ্তে গিয়েছিলেম, তার রোজই দুপুর বেলা জ্বর আসে।"

মহামায়া স্বামীর নিকটে নাড়ী পরীক্ষা ও টোটকা ঔষধ প্রয়োগ করিতে শিখিয়া ক্রমে ক্রমে এই বিষয়ে বেশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক সময়ে সময়ে তাহার শরণাপন্না হইত, মহামায়া তাহাদিগের কষ্টের লাঘব করিতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিল।

হেমলতা মহামায়ার কথা শুনিয়া কহিল, "আচ্ছা, এইবার তুমি আহ্নিক শেষ করে এস, আমি যোগমায়াকে ঘরে নিয়ে যাই।"

মহামায়া বলিল, "যাও, আমিও একটু পরে যাচ্ছি।"

নবম পরিচ্ছেদ

ফুলকুমারী

মহামায়া যখন শ্রীশচন্দ্রের সংসারে ছিল, তখন হইতে সে ফুলকুমারীর চরিত্র গঠন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, আজ সে সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলেও মহামায়া ফুলকুমারীকে ভুলিতে পারে নাই। ফুলকুমারী মহামায়ায় স্নেহ, শিক্ষা, উপদেশ প্রাণে প্রাণে ধারণ করিয়া তাহার সন্নিকটে থাকিতে বড়ই ভালবাসিত। কিরণশশী শ্রীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের ঘরণী, সে নিজের বিলাস, বসন, অঙ্গরাগ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, ফুলকুমারী দাসীর ন্যায়, পরিচারিকার ন্যায় সংসারের সকল কার্য্য করিয়াও, একবার দিনান্তে পিসী-মার কাছে যাইলেও কিরণশশী পুত্র-বধূর নামে স্বামীর সন্নিকটে অযথাভাবে অনেক কথা বলিত, এবং নিজে আপনার নূতন কাপড় ছিঁড়িয়া ফুলকুমারীর নামে দোষারোপ করিতে হৃদয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না।

ফুলকুমারী মহামায়ার উপদেশে সৎ-শাশুড়ীর সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত। আজ বৈশাখের পূর্ণিমা যামিনী, ফুলকুমারী সাংসারিক সকল কাজ শেষ করিয়া একাকিনী নিজ শয়নকক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিল, "হা ঈশ্বর! এ অভাগিনীকে কি তুমি চির দুঃখ ভোগ করবার জন্যই এ সংসারে পাঠিয়েছ? নারীর ইহজন্মের সার অবলম্বন যে পতি ধন, কোন্ পাপে আমি তাহা হতে বঞ্চিতা হলেম? জানি না,

তিনি এখন কোথায়! হে করুণাময়! তিনি যেথানেই থাক্ না কেন, তুমি তাঁর মঙ্গল কর। আমি সেই মূর্ত্তি ধ্যানে নিরীক্ষণ ক'রেই সুখ বোধ করব। পিসী-মা! পিসী-মা! তোমার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য, আমি তাঁর ছবি হৃদয়ে ধ'রে প্রাণে বড়ই আনন্দ পাই; তুমিই আমায় তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান করতে শিখিয়েছ। আমি অবলা, বহুকাল তাঁর অদর্শনে এ জীবন যাপন কর্‌ছি, আজ তাঁর প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন ক'রে আমি ধন্য হই।" এই বলিয়া ফুলকুমারী গৃহে প্রদীপ জ্বালিয়া সাতকড়ির একখানি ফটো চিত্র লইয়া স্বীয় বক্ষে ধারণ করিল। ঠিক এই সময়ে কিরণশশী সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, যে ফুলকুমারীর ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর সে একখানি ফটো লইয়া বলিতেছে, "প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করে আমি পবিত্র হই।" এ কথাটা তাহার ভাল বোধ হইল না, সে বাতায়ন-ছিদ্র হইতে ফুলকুমারীকে বার বার লক্ষ্য করিয়া ভাবিল, "হয়েছে, এতদিনে ধরা পড়েছে; কালামুখী কার ফটো নিয়ে এই গভীর রাত্রে জেগে আলাপ কর্‌ছে। না—আর ওকে এ সংসারে রাখা হবে না, দাঁড়াও এইবার তাকে দেখিয়ে দি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিরণশশী স্বীয় শয়নকক্ষে গিয়া শ্রীশচন্দ্রকে কহিল, "বৌ-মা তার ভালবাসার কোন্ পুরুষের চিত্র লইয়া রাত্রে আলাপ কর্‌ছে, দেখ্‌বে এস।"

ইহা শুনিবামাত্র শ্রীশচন্দ্রের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল, তিনি দ্রুতপদে কিরণশশীর সহিত আসিয়া বাতায়ন-ছিদ্রে চক্ষু রাখিয়া দেখিলেন যে, সত্যসত্যই তাঁহার পুত্রবধূ একখানি ফটো লইয়া তাহা একদৃষ্টে দেখিতেছে। কিছুক্ষণ দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র একটি সুদীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কিরণশশী কহিল, "এইবার হাতে হাতে ধরেছি, তুমি ঘরে যাও, আমি বৌ-মাকে ডেকে ফটোখানা কেড়ে নিয়ে তোমায় দেখাচ্ছি।"

শ্রীশচন্দ্র তাহাতে সম্মতি দান করিয়া নিজ শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। আর কিরণশশী ব্যাঘ্রী যেরূপ বনমধ্যে হরিণ দেখিয়া প্রফুল্লিতা হয়, সেইরূপ আনন্দসহকারে গম্ভীরস্বরে ফুলকুমারীর দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল, "বৌ মা!"

ফুলকুমারী শশব্যস্তে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া কহিল, "কি দরকার মা! তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

মুখভঙ্গী করিয়া কিরণশশী কহিল, "অসুখ আমার শত্রুর করুক, বলি এত রাত পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বেলে কি হচ্ছিল? তেল কিন্‌তে বুঝি পয়সা লাগে না?"

ফুলকুমারী কহিল, "প্রাণটা কেমন কর্‌ছিল বলে একটু বসে ছিলেম।"

কিরণশশী কহিল, "তা আমি দেখেছি; কই, তোমার সে ফটো দেখি, যাকে নিয়ে তোমার এত সোহাগ।"

ফুলকুমারী একটু বিস্ময়ান্বিতচিত্তে কহিল, "তুমি কি করে দেখ্‌লে মা! তোমার কথায় বোধ হচ্ছে, তুমি আমার উপর রাগ করেছ।"

কিরণ কহিল, "ও সব কথা থাক্, এখন সে ফটোখানা দেখি।"

ফুলকুমারী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে ফটোখানি কিরণের হস্তে অর্পণ করিল, কিরণ্ তাহা লইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। সরল হৃদয় ফুলকুমারী দ্বারে অর্গল দিয়া নিজ কক্ষে শয়ন করিল, সে বুঝিল না যে, কিরণ কি উদ্দেশ্যে সে ফটোখানি তাহার নিকট হইতে লইয়া গেল।

এদিকে শ্রীশচন্দ্র বৌ-মার চরিত্র সম্বন্ধে মনের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে কিরণশশী দ্রুতপদে আসিয়া সে ফটো তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিল, "এই দেখ, তোমার বৌ-মায়ের গুণ।

শ্রীশচন্দ্র সাগ্রহে সেই ফটো লইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যবেক্ষণের পর পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

কিরণশশী কহিল, "কি দেখ্‌লে ?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি এ ফটো কি দেখ নাই ?"

"আমি ও পর পুরুষের চেহারা দেখ্‌তে চাই না, তুমি কি দেখ্‌লে বল।" এই বলিয়া কিরণ শ্রীশচন্দ্রের নিকটবর্ত্তিনী হইল।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এখন শোও, পরে বল্‌ব।"

দশম পরিচ্ছেদ

হিতে বিপরীত

প্রতিবেশিনীগণ সেদিন যোগমায়াকে মূর্চ্ছাপন্নাবস্থায় অবস্থিতা দেখিয়া পাড়ার মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিল যে, সুরেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা একাদশীর উপবাস করিয়া মরণাপন্না হইয়াছিল; অতটুকু মেয়েকে মহামায়া খাইতে না দিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, অফিস হইতে আসিতে আসিতে পথে সুরেন্দ্রনাথ এ সংবাদ অবগত হইয়া যোগমায়ার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, তাঁহার পত্নী হেমলতাও যোগমায়ার বিষয় সুরেন্দ্রনাথকে কিছু জানাইল না, হেমলতা স্বামীকে এ বিষয় গোপন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সুরেন্দ্রনাথ যোগমায়াকে এত শৈশবকাল হইতে বার, ব্রতাদিতে উপবাস করিতে নিষেধ করিতেন; মহামায়া তাহাকে ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত রাখিবার জন্য অহঃরহ প্রয়াস পাইত, হেমলতা মহামায়ার অনুগত ছিল; সুরেন্দ্রের সংসারে মহামায়ার একাধিপত্য বিরাজিত। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ এতাবৎ-কাল কোন কার্য্য করিতে প্রয়াস পান নাই, আজ যোগমায়ার বিষয় অবগত হইয়া তিনি মহামায়ার উপর বিরক্ত হইলেন, হেমলতার মুখে এ সম্বন্ধে কোন কথা না শুনিয়া তাহার উপর ততোধিক বিরক্ত হই-লেন। ভাবিলেন, "স্ত্রী চরিত্র বুঝা ভার, আমি পাড়ার লোকের মুখে

আমার বাড়ীর যে খবর শুনিলাম, তাহা আমার ভগ্নী, আমার স্ত্রীর মুখে শুনিতে পাইলাম না, তবে ত ইহারা আমায় সকল কথা গোপন করে; বাড়ীতে কি হয় না হয়, সে সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারি না। যাহা হোক্—আর আমি স্থির থাকিব না, আমার ইচ্ছা পূরণ করিব। কোন বাধা মানিব না, কাহারও অনুরোধ রাখিব না, সমাজের মুখ চাহিব না, আমি যোগমায়ার আবার বিবাহ দিব। সে বাল-বিধবা, সংসারের কোন সুখ-সাধ বুঝিল না, স্বামীর স্নেহসিক্ত ছায়া হইতে শৈশবে বঞ্চিতা হইয়াছে, আমি তাহাকে আবার সেই স্নিগ্ধ ছায়া দান করিব। আমার অর্থের অপ্রতুল নাই, যত অর্থ ব্যয় হয় হউক, আমি অচিরেই যোগমায়ার বিবাহ দিব।"

হেমলতা ও মহামায়া উভয়ে যুক্তি করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে যোগমায়ার মূর্চ্ছার কথা বলে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল, এ কথা শুনিলে সুরেন্দ্রনাথ আর যোগমায়াকে উপবাসাদি করিতে দিবেন না, নানারূপ যুক্তি, তর্ক, অসুখ, অর্থব্যয় প্রভৃতির আলোচনা করিয়া তাহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিবেন। মহামায়ার এ ধারণা ঠিক হয় নাই, ফলে সুরেন্দ্রনাথ যোগমায়ার বিবাহ দিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করিলেন। অতি কষ্টে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বৈঠকখানায় বসিয়া সুরেন্দ্রনাথ যখন তামাক সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় কান্তি-চরণ ও হরলাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের আগমনে তত ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনার মনে আপনি ভাবিতেছিলেন, "আচ্ছা, বাঙ্গালায় কি চিরকাল অভাগিনী হিন্দু বিধবাদিগের অবস্থা একই ভাবে চলিবে? দেশাচার কি ভারতে এতই প্রবল? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনাথা হিন্দু বিধবার ভাবনায় স্বীয় প্রাণপাত করিয়াও এ দেশাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই; আমি

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ছার প্রাণী, আমি কি যোগমায়ার আবার বিবাহ দিতে সক্ষম হইব ?"

কান্তিচরণ ও হরলাল কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে উপবেশন করিবার পর, হরলাল সুরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বাবু, কি ভাবছেন ?"

কান্তিচরণ কহিল, "কাল আপনার বাড়ীতে বড় বিপদ্ গিয়েছে নাকি ?"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি বিপদ্ ?"

কান্তি। আপনার ছোট মেয়ে মূর্চ্ছা গিয়ে মারা যাবার মতন হয়েছিল ? শেষে সাহেব ডাক্তার এসে তাকে ভাল করেছে।

সুরেন্দ্র। তুমি এ সব খবর পেলে কোথা হতে ?

হর। আপনার বিপদ্ শুনেই ত আমরা ছুটে এসেছি।

ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "অনেকটা তাই বটে, যোগমায়া একাদশীর উপবাস করে মূর্চ্ছা গিয়েছিল।"

হরলাল কহিল, "আহা সে বালিকা ! না জানি তার কত কষ্টই হয়েছে।"

কান্তিচরণ সাগ্রহে কহিল, "আজ কেমন আছে বাবু ?"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আজ অনেকটা ভাল ; কিন্তু শোন, কান্তি-চরণ ! শোন, হরলাল ! আমি যোগমায়ার আবার বিবাহ দিতে স্থির সঙ্কল্প করেছি। যত অর্থ ব্যয় হয় হোক্, আমি তাতে কুণ্ঠিত হব না, তোমরা পাত্রের সন্ধান কর।"

হরলাল উৎসাহিতভাবে কহিল, "যে আজ্ঞা, আমরা আজ হতেই এ কার্য্যে ব্রতী হলেম।"

কান্তিচরণ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে কহিল, "এ কাজটা কর্বার আগে একটু ভেবে দেখ্লে হয় না, বাবু ?"

ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ভেবেছি—অনেক ভেবেছি, যেদিন যোগমায়া বিধবা হয়েছে, সেইদিন হতেই আমি ভাব্ছি। বাঙ্গালী গৃহস্থের অভিভাবকমাত্রেই এই বিধবাদিগের ভাবনায় আকুলিত। মানি আমি, বাঙ্গালায় বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্যপালনবিধি প্রশংসনীয়, কিন্তু কয়জনে তাহা প্রতিপালন করে? দেশাচারের মুখ চেয়ে আমি আমার বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত থাক্‌ব না। ভেবে দেখ, ভারতললনাদিগের আজ-কাল কি ঘোরতর অধঃপতন হয়েছে।"

হরলাল কহিল, "আপনি ঠিক ভেবেছেন, বাবু! আজ-কাল সর্ব্বত্রই অধর্ম্মের ভাব প্রবল; বাঙ্গালার বর কর্ত্তারা সমাজের জন্য ভাবে না, নিজ নিজ জাতীয় মঙ্গল চিন্তা করে না, তাহাদিগের মূল লক্ষ্য থাকে—পাত্রের বিবাহে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। যে দেশের লোক স্ত্রীলোকের মান-সম্ভ্রম রাখ্‌তে এত উদাসীন, সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান যে নারী, যাহারা নিজ নিজ স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সুখের জন্য আত্মত্যাগ কর্‌তে সদাই প্রস্তুত, যাহারা পুত্র পরিজনদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া নিজে সামান্য অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণে চিরাভ্যস্ত, যাহারা রোগে শুশ্রূষাকারিণী, বিপদে চিরসঙ্গিনী, যাহাদের নহিলে সংসার একেবারে অচল, তাহাদিগের বিবাহে এই ঘৃণিত অর্থ আদানপ্রদান প্রথা প্রচলিত? সমাজ কি চিরনিদ্রায় অভিভূত?"

কান্তিচরণ কহিল, "কি কর্‌বে বল দাদা? দেশাচার বড় শক্ত জিনিষ, কেউ কি একেবারে দেশাচারের বিরুদ্ধে কাজ কর্‌তে পারে? আমি জানি, আমাদিগের দেশের অনেক নামজাদা বড় লোক, যাঁহারা অর্থে সামর্থ্যে অতুলনীয়, তাঁহারাও ছেলের বিবাহের পাওনাটা ছেলের গর্ভধারিণীর দ্বারা ধার্য্য করিয়ে নেন। এই বাবু আমাদের দুটী মেয়ের বিয়ে দিতে কতই না অর্থ ব্যয় করেছেন।"

সুরেন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে কহিলেন, "অর্থ ব্যয় করেও নিস্তার আছে, এখনও আমি তাদের সকল ভার নিজে বহন করছি। বড় আশা করে আমি বড় মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেম। ছেলেটী বেশ লেখাপড়া জানে, বাপের বিষয়-সম্পত্তিও আছে, কিন্তু সে ঘোরতর মদ্যপ। তার উপর মেয়ের শাশুড়ীর মুখে কেবল 'দাও দাও' শব্দ। যত টাকা খরচ করে মেয়েকে তত্ত্ব করি না কেন, মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ীর তা পছন্দ হয় না। সেখানে মেয়ে থাক্‌লে লাঞ্ছনার এক শেষ, এখানে থাক্‌লে আর তাকে নিয়ে যাবার নাম করে না। ছোট মেয়ের ত কথাই নাই, আমি তাকে এখানে রেখে একপ্রকার নির্ভাবনায় আছি। তোমরা তার বিবাহের জন্য পাত্র স্থির কর—আমি বিধবা বিবাহ দিতে স্থিরসঙ্কল্প করেছি।"

কান্তিচরণ বলিল, "ভাল, আমরাও আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য কর্‌তে ত্রুটি কর্‌ব না।"

হরলাল কহিল, "ও-বেলা একটা খবর পাবেন বাবু?"

"বেশ।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ননীগোপালের সহৃদয়তা

হরেশচন্দ্র জীবনের সহিত চাকুরীলাভের প্রত্যাশায় ননীগোপালের সমীপে উপনীত হইলে, সে-হরেশচন্দ্রকে দুই-একটী ভদ্রলোকের বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া তথায় যাইতে বলিয়াছিল; এই ঘটনার কয়েকদিন পরে হরেশচন্দ্র পুনরায় ননীগোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তথন সন্ধ্যা-সতী তিমির বসনাবৃতা হইয়া জগতের ক্রোড়ে থাকিয়া উঁকি মারিতেছিল। ননীগোপাল হরেশচন্দ্রকে দেখিয়া কহিল, "আপনার কি সংবাদ বলুন ?"

হরেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি আপনার কথিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কোথায় সফলকাম হই নাই।"

ইহা শুনিয়া ননীগোপাল কহিল, "দেখুন, আমার সঙ্গে সেদিন একটা পাগলের দেখা হয়েছিল, তার সঙ্গে অনেক লোকের আলাপ, বিস্তর সাহেবের বাড়ী তার যাতায়াত আছে। সে বড় অমায়িক, আমার এক বন্ধু বলেন, সে পাগলা সাহেবদের বলে অনেকের ভাল ভাল কাজ করে দিয়েছে। চলুন তার কাছে যাই, আর তার দেখা না পাই, তা হলে আমার মেজ ভাই যে ছেলেটীকে পড়ায়, আপনি সেইটীকে পড়াবেন, আমার মেজ ভাই বি, এ পড়্ছে, এ সময়ে তার পড়্বার বেশ সময় হবে, আর আপনার কিছু উপকার হলেও হতে পারে। আমি বি, এল পরীক্ষা দিয়েছি, আপনাদের আশীর্ব্বাদে উত্তীর্ণ হলে বড় ভাল হয়, বাবার বিস্তর মক্কেল আমার মুখ চেয়ে আছে।"

ননীগোপালের কথা শুনিয়া হরেশচন্দ্র সাগ্রহে কহিলেন, "ভগবান্ আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আমি আপনার ক্ষতি করিয়া কাহারও বাড়ীতে ছেলে পড়াইতে ইচ্ছা করি না; আমি জীবনচন্দ্রের মুখে আপনাদের

বিষয় সমস্ত অবগত আছি, এ সময়েও যে আপনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমার উপকার করিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেজন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

ননীগোপাল কহিল, "না—না—আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না, আমি আমার মেজ ভাইকে ছেলে পড়ান কার্য্য হইতে অবসর দিয়া তাহাকে এক মনে পাঠাভ্যাস করিতে দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমি ছেলে পড়াইয়া উপস্থিত যাহা পাইতেছি, তাহাতে আমাদের সংসার এক রকমে চলিয়া যাইবে। ছোট ভাইটী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছে, তাহাকে ছেলে পড়াইতে দিই নাই। আপনি সংসারপালনে কষ্ট পাইতেছেন, এ সময়ে মেজ ভাইয়ের সে ছাত্রটীকে আপনি পড়াইলে আপনার উপকার হইতে পারে।"

হরে। সে পাগ্‌লা থাকে কোথায় ?

ননী। তার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, তবে সে সন্ধ্যার পর প্রায়ই বেলেঘাটার রাস্তায় শুইয়া থাকে, যে যা দেয়, তাহাই নেয়, কাহারও কাছে কিছু চায় না।

হরে। এ ভিখারী পাগ্‌লার কাছে আপনি কি আশা করেন ?

"জগতে কখন কে কি অবস্থায় থাকে, তা বলা যায় না। আমার কেবলই তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, সে বড় সরল হৃদয়বান্; চলুন, একবার তাহার কাছে যাই।" এই বলিয়া ননীগোপাল গৃহ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিল। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিক আঁধারে আবৃত, বৃষ্টি না পড়িলেও ঘন ঘন অশনিপাতে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতেছিল, পবনদেব আপন অমিতবল প্রকাশ করিয়া অসংখ্য বৃক্ষরাজির শাখা-প্রশাখাকে এক লহমায় ভূতলশায়ী করিতেছিলেন। প্রকৃতির এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিদর্শনে হরেশচন্দ্র কহিলেন, "দেখুন, এ

অভাগার দুরদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতিও বাদ সাধিল, আমি আপনার অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিলাম, এক্ষণে আসি। বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে বোধ হয়, শীঘ্র ছাড়িবে না, অন্য একদিন দেখা করিব।"

ননীগোপাল কহিল, "কোথায় যাইবেন, ঐ দেখুন বৃষ্টি পড়িতেছে, দরিদ্রের এ ভবনে এখন থাকিতে আপনার কষ্ট হইবে, এ গৃহের চারি-দিকেই জল পড়ে, একটু সাবধানে থাকুন। কি করি, আমাদের সব ছিল, অদৃষ্ট দোষে সব গিয়েছে; যদি ভগবান কখনও মুখ তুলে চান, ভাই দুটীকে মানুষ করিতে পারি, আর এবার ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তাহা হইলে অন্য একটী বাড়ী ভাড়া লইবার চেষ্টা করিব, নচেৎ ইহার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বাড়ীর সন্ধান করিতে হইবে।"

মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। হরেশচন্দ্রের আর যাওয়া হইল না, উভয়ে সেই ছোট প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া আপনাপন দুঃখের কাহিনী কহিতে লাগিল; গৃহের কোন স্থানেই জল পড়িতে বাকি ছিল না। ননী-গোপাল অতি সন্তর্পণে গৃহ সরঞ্জাম সরাইয়া, একটির উপর আর একটি দ্রব্য স্থাপন করিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ অবস্থিতির পর বৃষ্টি ছাড়িল, কিন্তু অনন্ত অম্বর কাদম্বিনীর আক্রমণ হইতে অব্যা-হতি পাইল না, ভীষণ আরবে বজ্র হাঁকিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে চির-প্রিয়া সৌদামিনীও দেখা দিতেছিল। এই ভীষণ দুর্যোগে হরেশচন্দ্র ননীগোপালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করি-লেন। কলিকাতার রাস্তায় সামান্য বারিবর্ষণেই জল জমিয়া যায়, যাঁহারা পথে থাকেন, তাঁহারা গৃহে ফিরিবার জন্যই এই জল ভাঙ্গিয়া পথ অতিক্রম করেন, অপরে বিশেষ কোন আবশ্যক না থাকিলে বড় একটা এরূপ সময়ে গৃহের বাহির হন না; হরেশচন্দ্র জুতা হস্তে করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, কাপড় আঁটিয়া পটলডাঙ্গা হইতে সারকুলার

রোড দিয়া বেনেপুকুর যাইতেছিলেন, তখন পথে জনপ্রাণী ছিল না, রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছিল। ধরিত্রীবক্ষে বারিরাশি ঠেলিয়া, মাথার উপর ভীম বজ্রের বিকট নির্ঘোষ লইয়া, সন্ত্রাসিতভাবে ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতেছিলেন, সৌদামিনীর ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বলালোক তখন তাঁহার বহু উপকার করিতেছিল, সেই আলোক সাহায্যে তিনি আশা প্রমোদিত হৃদয়ে নিজ সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেলেন।

প্রকৃতির এই ভীষণ প্লাবন সময়ে, যখন পশুপক্ষী প্রভৃতি সামান্য প্রাণীও পথে দেখা যায় নাই, সকলেই প্রাণের মায়ায় আপনাপন বাসায় লুকাইয়াছিল, এমন সময় শিবাদহ (শিয়ালদা) ষ্টেশনের অনতিদূরে একটি যুবক পরিভ্রমণ করিতেছিল। তাহার দেহ বেশ বলিষ্ঠ, মস্তকে ঘন সন্নিবিষ্ট দীর্ঘাকার কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পরণে সামান্য একখানি ধূতি, পরিধানপ্রণালী পশ্চিমবাসীদিগের মত। গাত্রে আর কোনও আবরণ ছিল না, সে এই দুর্য্যোগে যথায় রাস্তায় জল জমিয়াছিল, সেখানের মুহুরীগুলি নিজে খুলিয়া দিতেছিল; আর মনে মনে বলিতেছিল, "হায় ভগবান! কেন তুমি আমায় এ পরীক্ষাময় সংসারে পাঠাইয়াছিলে? আর যদিও বা পাঠাইলে, তাহা হইলে এ দীনভাবে জীবনযাপন করিতে দিলে কেন প্রভো! অথবা তোমারই বা দোষ কি? আমি আমার কৃতকর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতেছি। যে অবস্থায় রাখিয়াছ, দয়াময়! তাহাতেই যেন সন্তুষ্ট থাকি, আমি সামান্য প্রাণী, তৃণাদপি তৃণ, আমার সাধ্যমত লোক-হিতসাধন করি। যদি কখনও আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে প্রভো! আমার যেন হৃদয়ের প্রবৃত্তি এইরূপই থাকে; জ্বালা-যন্ত্রণাদিগ্ধ সংসারে, যথায় ভাই ভাইয়ের শত্রু, পিতা পুত্রের উপর বিরূপ, অসংখ্য

অনাথা কুমারীগণ অপাত্রের হস্তে পড়িয়া বঙ্গীয় সংসারের কণ্টকস্বরূপ ; তথায় প্রবেশ না করিয়া যেন এইরূপভাবে বেড়াইতে পারি। আমার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন কেহই নাই, আছ কেবল তুমি তোমার অপার করুণায় আমি এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ধারণ করিয়া আছি।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে যেমন বেলেঘাটার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময়ে তাহার কর্ণকুহরে একটি কাতরতাপূর্ণ শব্দ পরিশ্রুত হইল ; তাহা শুনিয়া যুবক ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কোথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল, তাহা স্থির করিয়া লইল। সে কাতরোক্তি অতি ক্ষীণ, গগণবিদারী ঘন ঘন অশনিপাতে, তাহার সে ক্ষীণশব্দ অনন্তে মিলাইয়া যাইতেছিল। যুবক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অদূরে একটি পাহারাওয়ালাদিগের ব্যবহৃত লণ্ঠন পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিল, কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ পাহারাওয়ালা এই দুর্য্যোগে পাহারা দিবার পরিবর্ত্তে আলো রাখিয়া, কোনও স্থানে শয়ন করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছে। আলো লইয়া আরও কিছু পথ অগ্রসর হইলে যুবক দেখিল যে,বেলিয়াঘাটা ষ্টেশন সন্নিকটস্থ পথিপার্শ্বে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, রাস্তার জলে তাহার দেহ অর্দ্ধ মগ্ন, দুটী কর্ণ দিয়া তখনও শোণিত নির্গত হইতেছিল। যুবক এই দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, আলোটী স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে রাখিয়া দেখিল; সেই রমণী ভদ্রবংশীয়—তাহার পরিধেয় বসন জলসিক্ত হইলেও বুঝা যাইতেছিল, তাহা মূল্যবান। যুবক তাহার নাসিকায় হস্ত স্থাপন করিয়া দেখিল যে, সে মৃতা নহে—জীবিতা, তখন সে আলো রাখিয়া রমণীকে অনায়াসে তুলিয়া লইয়া কোথায় চলিয়া গেল। ইহার ক্ষণকাল পরেই হীন পরিচ্ছদধারী একটি সাহেব হাবার ন্যায় হাব-ভাব প্রকাশ করিয়া সেই লণ্ঠন লইয়া প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ফটো-রহস্য

কিরণশশী যে ফটো লইয়া শ্রীশচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিল, তদ্দৃষ্টে শ্রীশচন্দ্রের প্রাণে ফুলকুমারীর উপর বিরক্তির ভাব উদয় না হইয়া অধিকতর স্নেহই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বহু দিবসের পর পুত্রের মুখ দেখিয়া আজ তাঁহার হৃদয়ে অতীত জীবনের কত কি ঘটনা মনে হইল। মনে পড়িল—প্রথমা পত্নীর সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকলাপ, অকৃত্রিম ভালবাসা, সরল হৃদয়, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার সেই দেবদুর্ল্লভ আত্মোৎসর্গ।

শ্রীশচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য কিরণশশীর সহিত প্রথমা পত্নীর স্বভাব-চরিত্রের তুলনা করিলেন, করিয়া মনের মধ্যে বড়ই আঘাত পাইলেন; ভাবিলেন, "যে পত্নীর জন্য আমি একদিন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবল তাহার হাস্যরসপূর্ণ মুখের দুটা কথা শুনিতে স্বগৃহে ছুটিয়া আসিতাম, যাহার সুখে আমি সুখবোধ করিতাম, যে সাতকড়িকে প্রসব করিয়া, একদিন তাহার প্রাণ পুলকিত ও আমাদের বাটী আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল, আজ সেই পত্নীর অবর্ত্তমানে, আমি তাহার নয়না-ভিরাম প্রাণের সামগ্রী সাতকড়িকে কোথায় রাখিয়াছি, যাহার অদর্শনে বৌমা আমার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছে। সে বালিকা, আমি জানিতাম না যে, তাহার হৃদয়ে এত দূর পতিভক্তির উদয় হইয়াছে; বুঝিতাম না যে, সে এতদূর পতিগতপ্রাণা। কিরণ

আমার মনে কি ভীষণ সংশয়ের ভাব জাগাইয়া দিতেছিল, নিরপরাধা সাধ্বীসতীর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত করিতেছিল। বৌ-মা! আমি তোমার হৃদয় বুঝিতাম না, এখন তোমায় চিনিয়াছি; যেরূপে পারি—আমি সাতকড়ির সন্ধান করিব, প্রাণপণে তাহাকে গৃহাভিমুখে আনিবার চেষ্টা করিব।"

কিরণশশী ফুলকুমারীকে নিজ সংসারে না রাখিয়া তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইবার জন্য অনেক প্রকার কৌশল করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র প্রায়ই সাতকড়ির জন্য উদ্বিগ্ন হইতেন, সে যেন সাতকড়ির প্রতিনিধিস্বরূপ এস্থলে রহিয়াছে, কিরণ সাতকড়ির এই স্মৃতিচিহ্ন শ্রীশচন্দ্রের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত করিবার প্রয়াসী; ফুলকুমারী যে রাত্রে ফটো দেখিতেছিল, কিরণ তাহা মহা-সুযোগ বুঝিয়া শ্রীশচন্দ্রকে তাহার বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার পর শ্রীশচন্দ্র যখন নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় কিরণশশী আসিয়া কহিল, "বলি ওগো, তুমি কি সে ফটোর কথা একেবারে ভুলে গেলে?"

শ্রীশচন্দ্র কহিল, "কোন্ ফটো?"

কিরণ সাগ্রহে কহিল, "সেই যে ফটো বৌ-মা রাত্রে নিয়ে আলাপ করেছিল—তুমি সে কথা ভুলে গিয়েছ?"

শ্রীশচন্দ্র দুঃখান্তকরণে বলিলেন, "না, ভুলিব কেন? সেই ভাবনাই আমায় অস্থির করিয়াছে; আমি অতীতের সকল স্মৃতি একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তুমি সেই ফটো দেখাইয়া আবার আমার মনে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছ?"

কিরণশশী উপযুক্ত সময় বুঝিয়া স্বামীর সদনে অধিকতর অগ্রসর হইয়া কহিল, "সে ফটোখানা আমি মাঝে মাঝে বৌ-মার হাতে দেখে

ভাব্‌তেম—সেটা কোন বাজে ছবি, সে রাত্রে সেদিকে যাবার সময়ে তার মুখে সেই কথা শুনে আমার সন্দেহ হ'ল, তাই তোমায় ডেকে দেখিয়েছিলেম।"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি কি সে ফটো দেখ নাই।"

কিরণ। না, সে পরপুরুষের ফটো আমার দেখ্‌বার দরকার নাই। তুমি সে ফটো বৌ-মাকে দিতে বলেছিলে, সেটা তার কাছেই আছে।

শ্রীশ। একবার সে ফটোখানা চেয়ে আন দেখি।

"আর দেখে কি কর্‌বে, মিছে মন খারাপ হবে বৈ ত নয়, তুমি এই বেলা ভালয় ভালয় ওকে বাপের বাড়ী পাঠাও।" এই বলিয়া কিরণশশী শশব্যস্তে ফুলকুমারীর নিকট হইতে সে ফটো আনিতে গেল; শ্রীশচন্দ্র দুঃখিতচিত্তে সাতকড়ির মুখশ্রী ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই কিরণশশী ফিরিয়া আসিল, শ্রীশচন্দ্র ফটোখানি তাহার হস্ত হইতে লইয়া কিরণের নয়নসমীপে রাখিয়া কহিল, "দেখ দেখি, এ কাহার চিত্র?"

কিরণশশী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কার—তা আমি কি জানি? তোমার বৌ-মার কে ভালবাসার লোক—তার সন্ধান তুমি কর; আর না পার, ঠাকুর-ঝীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর। তার কাছে কাছে বৌ-মা প্রায়ই থাকে, আমি নিষেধ কর্‌লেও শোনে না।"

শ্রীশচন্দ্র কিরণের কথা শুনিয়া বিরক্তভাবে সেই ফটো তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "দেখ, ভাল করে দেখ।"

কিরণ অবজ্ঞায় আবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ও পরপুরুষের ফটো, আমায় দেখান কেন?"

শ্রীশচন্দ্র মৃদুহাস্তে কহিলেন, "তুমি ভুল বুঝিয়াছ কিরণ! এ ফটো তুমি আমায় দেখাইয়া ভাল কর নাই। আমি সব ভুলিয়াছিলাম,

তুমিই আমার হৃদয়ের সমস্ত স্থানে বিরাজিতা ছিলে, কিন্তু এ ফটো দেখিয়া অবধি আমি বিচলিত হইয়াছি। এ ফটো আর কাহারও নয়, আমার প্রথম পুত্র—সেই সাতকড়ির। বৌ-মা আমার সতীলক্ষ্মী, স্বামীর অদর্শনে তাহারই চিত্র বুকে রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে। সতীর কর্ত্তব্য যাহা, সে তাহাই করিয়াছে; আমি মহামায়াকে জানি—সেই বোধ হয়, বৌ-মাকে এইরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছে। এ ফটো তোমার পুত্রের, তুমি মাতা—পুত্রের ফটো দেখিতে কুণ্ঠিতা হইও না; এই নাও, বৌ-মাকে দিয়ে এস।"

কিরণ ফুলকুমারীর হস্ত হইতে ফটো লইয়া ঈর্ষাপরবশে তাহা আদৌ দেখে নাই, এক্ষণে শ্রীশচন্দ্রের মনোভাব বুঝিয়া আর কিছু বলিল না, একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ ফটো সাতকড়ির! ও হরি! আমি মনে করেছিলেম, আর কাহারও। তা যাক্—ও সব কথা আর ভেব না, আর ত কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না—কি কর্‌বে বল।"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "কি কর্‌ব, সেই ত ভাবনা। বাল্যে সযত্নে পালিত শিশু বড় হয়ে কোথায় আমার সাহায্য কর্‌বে, না সে আজ নিরুদ্দিষ্ট! সকলই অদৃষ্টলিপি। সে গিয়েছে, কিন্তু বৌ-মাকে দেখে আমি তার কথা মাঝে মাঝে ভাব্‌তেম, সে ভাবনা অতি ক্ষণস্থায়ী হত। তুমি যেদিন আমাকে ঐ ফটো দেখিয়েছ, সেইদিন হ'তে কি জানি, আমি যেন সাতকড়িকে পাবার জন্য আকুল হয়েছি। বৌ-মার পতিভক্তি দেখে আমার হৃদয় বিচলিত হয়েছে—যেরূপে পারি, সাতকড়িকে বাড়ী ফিরিয়ে আন্‌বার উপায় কর্‌ব।"

কিরণ যে উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্বামীকে ফটো দেখাইয়াছিল, তাহা পূর্ণ না হইয়া তদ্বিপরীত ফল ফলিল। জগতে যে যাহা

মনে করে, তাহা কি পূর্ণ হয়? কি জানি, কোথা হইতে কি এক অজ্ঞাত শক্তি আসিয়া মানবের সমস্ত আয়োজন পণ্ড করিয়া দেয়। এ ক্ষেত্রে কিরণের তাহাই ঘটিয়াছে। সে স্বামীর মন অন্যদিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল; বলিল, "তা করো, এখন ও বাড়ীর খবর শুনেছ?"

শ্রীশ। কি?

কিরণ। ছোট-ঠাকুরপো যে যোগমায়ার আবার বিয়ে দেবার জন্য ঠিক করেছে।

শ্রীশ। সুরোর কথা ছেড়ে দাও—তাকে বারণ করলেও শোনে না, আমি আর তার কোনও কথায় থাকব না।

কিরণ। ঠাকুর-ঝীরও কথা শোনে না, সেজন্য সে-ও আর ওখানে থাক্‌বে না, শুন্‌ছি—বড়-দিদি যেখানে বাড়ী ভাড়া করে আছে, সেখানে যাবে।

শ্রীশ। বটে, এতদূর গড়িয়েছে! দেখি, যদি আমি ব'লে-ক'য়ে এবার মহামায়াকে এখানে রাখ্‌তে পারি, সে থাক্‌লে এ সংসারে তোমার কোন ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।

"আর রক্ষে কর। সে এখানে থাক্‌লে বৌ-মা কি আমার কথা শুন্‌বে, কেবলই তার কাছে কাছে থাক্‌বে—ফিস্‌ফিস্‌ কর্‌বে, কাজে মন দেবে না, তুমি ও কাজটি করো না। এখন রাত হয়েছে, খেতে হবে—না?" এই বলিয়া কিরণ শ্রীশচন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিল।

শ্রীশচন্দ্র সে বিষয়ে আর কোন কথা না পাড়িয়া কহিল, "চল।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কান্তির কৌশল

প্রভাতকাল। তখনও অরুণোদয় হয় নাই, বিহঙ্গমকুল মধুর কাকুলি ধ্বনিতে জীব প্রাণে নবভাবের সঞ্চার করিতেছিল, প্রকৃতিরাণী নীলাম্বরী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বসন পরিধানপূর্ব্বক জগতে উজ্জ্বল আলোক দান করিতেছিলেন। অনন্ত অম্বর হইতে তারকামালা একে একে অন্তর্হিত হইতেছিল, চন্দ্ররশ্মিও নিষ্প্রভ। পূর্ব্বাকাশে দিননাথ ধীরে ধীরে উঁকি মারিতেছিলেন। জগতের ইহাই চিরন্তন নিয়ম, এক আসে—আর যায়, আবার যাহা যায়, ঘূর্ণাবর্ত্তের ঘোর আবর্ত্তনে পড়িয়া তাহা আবার প্রকৃতিক্রোড়ে ফিরিয়া আসে। ঐ যে লোহিত রবি স্ফীতবক্ষে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া ধরাতলে আসিতেছেন, উনিও কালে নিষ্প্রভ হইবেন, আর এই প্রভাহীন চন্দ্রকরও কালে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া আবার জীবহৃদয়ে আনন্দ দান করিবেন। প্রকৃতির এই শুভক্ষণে, একের পতন ও অপরের অভ্যুদয়কালে, কলিকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের উপর দিয়া কান্তিচরণ গাত্রে নামাবলী, রিক্তপদে, ধীরে ধীরে দেবদেবীর নামোচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর তাহার সহিত জীবনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। জীবনকে দেখিয়া কান্তিচরণ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "রাধে রাধে।"

জীবন তাহার মুখে এই "রাধে রাধে" শুনিয়া কহিল, "ইস্! খুড়ো যে একেবারে ভাবে গদগদ।"

কান্তিচরণ কহিল,"আর বাবা, চিরকালটা কি একই ভাবে কাটবে, বয়সও ত হ'ল, দেবদেবতার নামও চাই। ভবসমুদ্র পার হ'তে হবে বাবা! যাই, একবার মাকে দেখে আসি, রাধে রাধে।"

জীবন সহাস্যে কহিল, "তা খুড়ো! হিন্দুর দেবদেবীর ত অভাব নাই, এত নাম ছেড়ে আজ তোমার রাধের প্রেম উতলে উঠল কেন বাবা?"

কান্তি। সব চাই বাবা, সময়ে সব চাই; রাধে আমাদের সাক্ষাৎ প্রেমময়ী, সকালে রাধের নাম করলে সমস্ত দিনটা প্রেমালাপে কাটে, এই উদ্দেশ্য আর কি।

জীবন। বাঃ, তা ঠাউরেছ বেশ! হাঁ খুড়ো! সুরেন বাবু তাঁর বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি? তোমরা সব পাত্র ঠিক করছ।

কান্তিচরণ অনেক স্থলে ঘুরিয়াও পাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, জীবনের মুখে বিধবা-বিবাহের কথা শুনিয়া কহিল, "রাধে রাধে, হাঁ—কথাটা ঠিক, এখন রাধের নামে একটি পাত্র ঠিক করতে পারলেই হয়। বলি হাঁ বাবা, তুমিই একটু লগ্ন দাও না, আমি তোমার সঙ্গে না হয়, এ সম্বন্ধটা ঠিক করে ফেলি। চিরকালটাই কি একই ভাবে থাকবে? তখন বুড়ো মা ছিলেন, এক রকমে কাটত, এখন কত কষ্ট তা অনুভব করছ ত?"

জীবন বলিল, "কষ্ট কি, কিছুই নয়। একটু মনের জোর থাকা চাই, ছেলেবেলা থেকে আমি মেসো মশাইয়ের কাছে মানুষ; বেশী কষ্ট হয়—আন্দুলে গিয়ে থাকব।"

"না বাবা, একটু বোঝ; আমি এখন গঙ্গাস্নান ক'রে আসি,

বৈকালে তোমার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌ব। সুরেন বাবুর পয়সা খুব, তাঁর বিধবা মেয়েকে বিয়ে কর্‌লে তোমার একটা হিল্লে হ'বে বাবা, হিল্লে হ'বে।" এই বলিয়া কান্তিচরণ গঙ্গাস্নান করিতে গেল।

এ জগতে মানুষ ধর্ম্মের নামে নানারূপ কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকেন, কান্তিচরণ গঙ্গাস্নান করিবার ছলে পাত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছে। প্রভাতকালে গঙ্গাতীরে অনেক লোক সমাগম হয়, এ স্থলে অনেকেই আপনাপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, বিশেষতঃ পবিত্রসলিলা উত্তাল তরঙ্গমালা সংক্ষুব্ধা ভাগীরথীবক্ষে, বাঙ্গালী একবার যাহা প্রতিশ্রুতি করে, তাহা সহজে ভঙ্গ করে না। কান্তিচরণ পাত্রের আশায় গঙ্গা স্নান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, নচেৎ বাল্যাবধি সে গঙ্গা স্নানে বড় একটা অভ্যস্ত ছিল না।

কান্তিচরণ প্রস্থান করিলে পর জীবনচন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল "আচ্ছা, বিবাহটা কি? খুড়োর মতে লম্ব দিয়ে একটা বিবাহ কর্‌ব? চিরকালটাই কি এ রকমে যাবে? এতে সুখ কি তা ত বুঝ্‌লেম না। মা ছিলেন, তখন বড় একটা অভাব জান্‌তে পারি নাই, এখন প্রাণ যেন একটা কি চায়; নিজে হাতে রাঁধি, তবে খাই। দাদা বিদেশে রইলেন, ভাইপোরাও দেখা-শুনা করে না, মেসো মশাই খোঁজ-খবর রাখেন, তাই রক্ষা! এ অবস্থায় বিবাহ কর্‌ব? না—এ আছি বেশ, বিবাহ কর্‌লে নানা ফ্যাসাদ হবে। বৌ আস্‌বে, এসে কেবলই ঘেন্ ঘেনাবে, পেন্‌পেনাবে, সাধ্যসাধনা কর্‌তে হবে; এটা চাইবে, ওটা চাইবে। এ দাও, তা দাও, না—এ সব আমার পোষাবে না। কান্তি খুড়ো বিবাহের কথা তুলে আমার মাথাটা গুলিয়ে দিয়ে গেল দেখ্‌ছি। একটা বিবাহ করি। বি—বা—হ—বেশ লম্বা—মোলায়েম কথা। একে বিবাহ—তার উপর বিধবা। এ যে ক্রমশঃ কথাটা বেড়ে গেল

দেখ্‌ছি, বিধবা বিবাহ। না বাবা—বাড়াবাড়ি ত ভাল নয়। বিবাহ কর্‌লে প্রেম, পীরিত, ভালবাসা এ সব শেখা চাই। প্রেম, পীরিত, ভালবাসা—এ ক'টার ভিতর কথাগুলো ক্রমশঃই বেড়ে গিয়েছে। প্রেম—বেশ ছোট-খাট কথা, অনেকক্ষণ আওয়াজ থাকে, প্রে—ম। কথাটাও মিষ্টি—বেশ শান্তিপ্রদ। তার পর পীরিত, প্রীতি হ'তে পীরিতি, তা হ'তে পীরিত—এটা বড় গোলমেলে গোছ; তার পর ভালবাসা, এ কথাটা খুব লম্বা-চওড়া, কিন্তু আওয়াজ একটুখানি। না—আমার ছোট কথাই ভাল, মা! একটু কথা, মুখভরা—বুকভরা আওয়াজ। দূর হোক্, এ মাথা গুলিয়ে গেল; দেখি—একবার ননী-গোপালের কাছে গিয়ে, সে এ বিবাহ কর্‌তে মত দেয় কিনা, তার পর আমার(আন্দুলের)মেসো মশাই ত আছেনই।" এই বলিয়া জীবনচন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হেমলতার আকুলতা

"ঠাকুর-ঝি! কি হবে ভাই?"

"ছোট বৌ! ভেব না, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তুমি আমি ভেবে কি করব বল! ছোট দাদা যোগমায়ার বিবাহ দেবেই দেবে, আমি তাঁকে অনেক রকমে বুঝিয়েছিলেম, তিনি আমার কথা শুন্‌লেন না, আর কোন আশা নাই। জানি না, ছোট দাদার প্রাণের ভাব কি? ব্রাহ্মণের পুণ্য-নিকেতনে কোন্ নিদারুণ অভিশাপে এ দুর্ঘটনা ঘট্‌বে।"

জৈ্যষ্ঠ মাস, বেলা তৃতীয় প্রহর, তখনও তপনের প্রখর তেজে ধরাতল উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে, পশুপক্ষীগণ কচিৎ পথে পরিদৃষ্ট হইতেছে। নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ অলস-অবশ তনু হেলাইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে, এমন সময়ে এক দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া হেমলতা ও মহামায়া পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিল।

মহামায়ার কথা শুনিয়া হেমলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ঠাকুরঝি! আমার কি দুরদৃষ্ট, মেয়েদের নিয়ে একদিনও সুখী হলেম না, বড় আশা ক'রে যোগমায়ার বিয়ে দিয়েছিলেম, কে জানত যে সে এত শীঘ্র বিধবা হবে, আর তাকে নিয়ে আমায় এত জ্বালাতন হ'তে হবে?"

মহামায়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া কহিল, "কেঁদ না ভাই, চুপ কর। রমণী সাক্ষাৎ ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, বিপদে অধৈর্য্য হ'য়ো না, বুক পেতে সব সহ্য কর; সংসারে প্রতিনিয়ত কত ঘটনা ঘ'টে থাকে, সে সব দেখে ভয় পেলে কি হ'বে বল। এ সংসারের গৃহিণী, জননী তুমি! তুমি এত উতলা হ'লে, ছোট ছোট মেয়েরা কি করবে বল দেখি।"

হেমলতা বলিল, "দেখে-শুনে আমার আর হাত পা আসে না

ভাই! কাল রাত্রে তাঁকে কত অনুনয়-বিনয় ক'রে এ বিবাহ দিতে নিষেধ করেছিলেম, তিনি শুন্‌লেন না। তুমি এ সংসার ছেড়ে যাবে বল্‌লেম,তাতেও ভ্রূক্ষেপ কর্‌লেন না; বল্‌লেন, যায় যাবে, ক্ষতি কি?"

মহামায়া কহিল,"আমি সেইখানেই যাব, ননীগোপাল আমায় নিয়ে যাবে, বড় বৌ-দিদির স্নেহ আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে, ছেলেবেলায় মা হারিয়েছিলেম,তাঁর স্নেহে আমি একদিনের জন্যও মা'র অভাব বোধ করিনি, আবার আমি তারই কাছে ফিরে যাব। কিন্তু আমার মন এখানে থাক্‌বে, যোগমায়াকে আমি হাতে ক'রে মানুষ করেছি। বৈধব্য অবস্থায় সে আমার বুকের ধন, তার আবার বিবাহ আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না, তাই আমি এখান হ'তে যাচ্ছি। তুমি স্বামীর অবাধ্য হয়ো না—স্বামী সন্তুষ্ট থাক্‌লে স্ত্রীর কোন কষ্ট হয় না। মানুষে যা চায়, তা পায় কি? ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে চল, তাঁর ইচ্ছায় সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, অকাতরে কার্য্য কর, মঙ্গলামঙ্গলের জন্য ভেবো না, ফলাফল তাঁহারই চরণে অর্পণ কর। যা ঘট্‌বার, তা ঘট্‌বেই—চিন্তায় দেহ নষ্ট ক'রো না।"

"ঠাকুর-ঝি! মনে করি ভাব্‌ব না, কিন্তু কি জানি কোথা হ'তে অনন্ত চিন্তারাশি এসে আমার মনকে ছেয়ে ফেলে। এ বিধবা বিবাহ হ'লে আমরা যে এক ঘরে হ'য়ে থাক্‌ব। ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের বিরোধী হ'য়ে ইনি যে কার্য্যে লিপ্ত হচ্ছেন, তার ফল কি শুভপ্রদ? তুমি এখান হ'তে চ'লে গেলে আর আস্‌তে পাবে না, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হবে। সমাজবন্ধন শিথিল ক'রে কে আমাদের মুখ চাইবে?" এই বলিয়া হেমলতা কাঁদিতে লাগিল,বাঁধ-ভগ্ন জলস্রোতের ন্যায় তাহার অশ্রুধারা বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলিল। মহামায়া তাহার অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিল; সে মনের বেদনা মনে

চাপিয়া হেমলতাকে বলিল, "ছোট বৌ! বৃথা দুঃখ কর্‌ছ, জগতে কে ক'দিনের জন্য ? আর এ সব সম্পর্কই বা কতকাল স্থায়ী ? যোগমায়ার বিবাহের ফলাফলের উপর এ সংসারের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর কর্‌ছে ? যদি এ বিবাহের ফল শুভ হয়, তা হ'লে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিষম অভাব মোচন হবে, আর যদি এত চেষ্টা, এত উৎসাহ, এত জেদের ফল অশুভ হয়, তা হ'লে তোমার অধঃপতনে বাঙ্গালী যেন আর এ হেন দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করে। রমণী করিতে পারে না, এমন কার্য্য এ জগতে কিছু আছে কি ? পুণ্যে পরোপকারে, শান্তি মুক্তিদানে, অশান্তির অনল জ্বালিতে, রমণীই পুরুষের চির সাহায্য-কারিণী। ভগ্নি! আত্মবলিদানে কুণ্ঠিতা হ'য়ো না, স্বামী তোমার ইহ-কাল পরকাল, তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা হ'তে নিবৃত্ত করা সহজ নহে। তাঁহার বিপক্ষতাচরণ কর্‌লে তিনি তোমার উপর বিরক্ত হবেন ; হিন্দু রমণী তুমি,পতির মঙ্গলোদ্দেশ্যে তাঁহার মতিগতি ফিরাবার চেষ্টা কর ; না পার, তার স্বাপক্ষে কাজ কর।"

তাহারা যখন পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে তথায় বটুলাল আসিয়া কহিল,"মাসী-মা! একটা পয়সা দাও না।"

বটুর বয়স অষ্টম বর্ষ, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কালকাতায় আসিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিলেও বটুলাল কিছুই শিখিতে পারে নাই। কলিকাতার রাস্তার দু' ধারে যাহা বিক্রয় করিতে যাহত, তাহাই খাইবার জন্য সময়ে সময়ে আসিয়া মাসী-মা'র কাছে আব্‌দার করিত। মাসী-মা স্নেহবশতঃ তাহার সকল আব্‌দার রক্ষা করিত। আজ সে স্কুল হইতে আসিয়া মাসী-মা'র নিকটে একটা পয়সার জন্য প্রার্থনা করিলে হেমলতা কহিল, "পয়সা কি হবে বাবা ? দিদিমণিদের কাছ হ'তে খাবার চেয়ে খাওগে।"

বটুলাল পেটে হাত বুলাইয়া কহিল, "খাবার ত খেয়েছি, এ একটা নূতন জিনিস খাব।"

হেম। কি জিনিস?

বটুলাল সহাস্যে কহিল, "জুতা বুরুষ খাব, একটা পয়সা দাও।"

ইহা শুনিয়া মহামায়া বলিল, "জুতা বুরুষ কি খায় বাবা? সে খাবার জিনিস নয়।"

বটু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে, সে কাঁদ-কাঁদস্বরে কহিল, "আমি খাবই খাব, ঐ রাস্তায় একটা লোক যাচ্ছে, তার কাছে জুতা বুরুষ আছে।"

মহামায়া তাহাকে আর কিছু না বলিয়া হেমলতাকে কহিল, "যাও বৌ! একটা পয়সা ফেলে দিয়ে এস; ও তোমার গাধা পোষা হচ্ছে।"

"মিছা নয়", বলিয়া হেমলতা উঠিয়া গেল, বটুলাল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহার পশ্চাদনুধাবন করিল।

মহামায়া নিজের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে কহিল, "যাই, আমি আর ভেবে কি কর্‌ব? সে একদিন ছিল, যখন মেজ দাদা আমার টাকার লোভে তাঁর সংসারে যত্ন করে রেখেছিলেন, সে টাকা গেল—মেজ দাদার আদরও ফুরাল। তখনও গতর ছিল, সে গতর খাটাব ব'লে ছোট দাদার সংসারে এসেছিলেম। এখন সে অর্থ-সামর্থ্য কিছুই নাই, তবে কি নিয়ে আমি বড় বৌ-দিদির কাছে যাব। বাল্যে সেই ত আমার সহায় ছিল, তখন আমার অর্থ-সামর্থ্য কিছুই ছিল না, তবে আবার তার কাছে আমার মান অভিমান কি? শৈশব স্মৃতি নিয়ে আমি আমার শৈশব সাহায্যকারিণীর কাছেই ফিরে যাই।" এই ভাবিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কে এ রমণী

বেলিয়াঘাটা ষ্টেসন সন্নিকটস্থ পথ হইতে যে রাত্রে যুবক সেই মৃত-কল্পা রমণীকে আপন আবাসে লইয়া গিয়াছিল, তাহার পর দুই দিবস অতিবাহিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেহ যুবতীর কোনও সন্ধান করে নাই, তাহার জন্য যুবক নানাস্থল হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিল। যুবক বেলেঘাটা হইতে দূরবর্ত্তী সুড়োর এক নিবিড় বনমধ্যে বাস করিত; সে যে স্থলে থাকিত, তাহা এক পতিত জমী। তথায় কোন লোক সমাগম হইত না। যুবক এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া দু'-একখানি সামান্য তৃণাচ্ছাদিত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। দিনমানে সে যে কোথায় থাকিত, তাহা কেহই জানিত না; রাত্রে আসিয়া সে তথায় শয়ন করিত। সেই গভীর রাত্রে যুবক সেই রমণীকে স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক এই কুটীরে রাখিয়া, তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিল, এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণে মনঃ স্থির করিয়া আহার্য্যাদি ও পরিধেয় বসন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সে যে কোন্ বংশ-সম্ভূতা, কি কারণে পথে পরিত্যক্তা অবস্থায় শায়িতা ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সময় ও সুযোগ পায় নাই।

আজ পূর্ণিমাযামিনী—দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ, ধরিত্রীবক্ষে শশাঙ্কের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছে। বনভূমির চতুষ্পার্শে জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই, কচিৎ নিশাচর বিহঙ্গমগণের পক্ষধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল,

কখনও শিবাদল সানন্দে চীৎকার করিতেছিল, এমন সময়ে যুবক সেই পর্ণকুটীরে বসিয়া রমণীকে বলিতেছিল, "মা! উপস্থিত তুমি বোধ হয় কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছ—তোমার বাড়ী কোথায় বল, আমি সেখানে রাখিয়া আসিব, এ স্থলে তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, দীনাতিদীন সামান্য প্রাণী আমি, তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব, আচার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতেছি, তুমি কোনও উচ্চবংশোদ্ভবা মহিলা। জানি না, কোন্ ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া, তুমি সেই বিঘোর যামিনীতে সহায়সঙ্গীহীন অবস্থায় পথিমধ্যে একাকিনী শায়িতা ছিলে।"

যুবকের কথা শুনিয়া রমণী মস্তকের অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে তখন কোন কথাই নিঃসৃত হইল না, সে অবনত মস্তকে সরলা বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

যুবক তাহার অবস্থা বুঝিয়া কহিল, "মা! আমার কাছে তুমি আত্মপরিচয়দানে কুণ্ঠিতা হইও না, আমি সংসারে নির্লিপ্ত, আমার মাতা, পিতা, আত্মীয়স্বজন কেহই নাই, এ নশ্বর দেহ যতদিন থাকিবে, ততদিন ভগবোচ্চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া যেন পরহিতসাধনে কখনও পরাঙ্মুখ না হই। মা! আমায় তোমার সন্তানজ্ঞানে পরিচয় দাও, আমি সাধ্যানুসারে তোমায় নিরাপদে বাটীতে রাখিয়া আসিব।"

রমণী ছলছলনেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার বাটী যাইবার পথ বন্ধ, আমি স্বামীহীনা—তথায় বোধ হয়, আমার আর প্রবেশাধিকার নাই।"

যুবক সবিস্ময়ে কহিল, "কেন? তোমার বর্ত্তমান অভিভাবকেরা কি তোমার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত করিয়া, তোমার মৃত্যুকামনায় সেই ভীষণ দুর্য্যোগময়ী রজনীতে পথে ফেলিয়া গিয়াছিল?"

রমণী কহিল, "না, এ হতভাগিনী নিজ বুদ্ধির দোষেই সেইরূপ

অবস্থাপন্না হইয়াছিল, বোধ হয়, সে ভাবে আর কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিলে আমি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতাম, আমার তাহাই অভিপ্রেত ছিল, আপনি আমায় বৃথা যত্ন করিয়া সে মৃত্যুপথ হইতে ফিরাইয়া লইলেন, আমি মরিলে সব ফুরাইয়া যাইত, আর কাহাকেও আমার পরিচয় দিতে হইত না।”

যুবক বুঝিল যে, সে রমণী কোনও মর্ম্মান্তিক শেলাঘাতে নিজের জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে ; ইহা ভাবিয়া কহিল, “মা ! এ কর্ম্ম-ময় সংসারে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকামনা কেন ? তুমি রমণী—জননীর জাতি। তোমাদের পুণ্যগাঁথায় বাঙ্গালীরা আজও গর্ব্বিতশিরে, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। পুরাণে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা পড়িয়াছি, তোমরা তাঁহাদেরই জাতি, ইচ্ছা করিলে তোমরা নিজের চরিত্রগুণে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, সেই পুণ্যময় সুখময় স্বভাবচরিত্রের আনন্দ সুখস্মৃতি অহঃরহ জাগাইয়া তুলিতে পার। মরিলে ত সব ফুরাইয়া যায়, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকামনা করিও না, নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী সৎকার্য্যে মনোনিবেশ কর, যাহার কীর্ত্তিগুণে মৃত্যুও তোমার নাম ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত করিতে পারিবে না।”

ইহা শুনিয়া রমণী যুবকের মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “আপনার হৃদয় মহত্বে পূর্ণ, আমায় আপনি মাতৃসম্বোধন করিয়া আপ্যায়িতা করিয়াছেন, আশা করি—আমার পরিচয়ে আপনি ঘৃণা প্রকাশ করিবেন না। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা—নাম শ্যামাঙ্গিনী, অদৃষ্টদোষে বিপথে পরিচালিতা হইয়াছি, সাধারণ্যে বোধ হয়, এখন আমায় কুলত্যাগিনী বলিয়া আখ্যাত করিবেন। এক নরাধম আমায় নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনে, সে রেল,

গাড়ীতে আমার সমস্ত গাত্রালঙ্কারাদি নিজে নিরাপদভাবে রক্ষা করিব বলিয়া গ্রহণ করে, তখন তাহার চাতুরী আমি বুঝিতে পারি নাই, রেল হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর পদব্রজে যাইতে যাইতে, সে ব্যক্তি আমার নাসারন্ধ্রে কি একটা সতেজ পদার্থ ধারণ করে, তাহাতেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, তখন সামান্য বৃষ্টি পড়িতেছিল, তার পর যখন আমার পুনরায় চৈতন্যোদয় হয়, তখন আমি আপনার এই আশ্রমে।"

শুনিয়া যুবক কহিল,"বুঝিয়াছি, সে নরাধম তোমার বিষয়ৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তোমার পিতৃকুলে কেহ আছেন?"

শ্যামা। না, আমার শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সে সকল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধা জননীর সহিত দীনভাবে কালযাপন করিতাম, তার পর আমি বড় হইলাম, মা আমার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, শেষে এক বয়োবৃদ্ধ তৃতীয় পক্ষের পাত্র আমায় বিবাহ করেন। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর, বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহলীলা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার বিষয়-ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু ছিল, সে সকল সতীনপো'দের হস্তগত হইল, তাহারা আমায় সর্ব্বদা অনাদর করিত, আমার গাত্রাভরণ প্রভৃতি হস্তগত করিবার জন্য নানারূপ কৌশল ও অত্যাচার করিতে লাগিল। অনাথা আমি, আত্মরক্ষার্থে আমাদের বাটীর এক বয়োবৃদ্ধ সরকারের শরণাপন্ন হই, সে আমার স্বামীর বিষয় আমার আয়ত্তাধীন করিয়া দিবার আশা দেয়, মোকদ্দমা করিবার ছলে আমায় কলিকাতায় আনিয়া ভাল ভাল উকীল মোক্তারের পরামর্শ লইতে বলিল। শ্বশুরালয়ে জ্বালা-যন্ত্রণার দায় হইতে মুক্তির আশায় আমি তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, হায়! তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তার মধুমাখা সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যের ভিতরে এ হেন ঘৃণ্যভাব লুক্কাইত ছিল।"

যুবক। সে কৃতঘ্ন, ক্লোরাফরম সাহায্যে তোমায় অচৈতন্য করিয়া, তোমার সমস্ত গাত্রাভরণ হস্তগত করিয়াছে, এ কার্য্যে নরপিশাচ বল-প্রয়োগেও বিরত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার বাড়ী কোথায় বল, আমি রাখিয়া আসিব; এ বনভূমিতে তোমার অবস্থিতি করা আমি নিরাপদ বলিয়া বিবেচনা করি না।

শ্যামা। না, আর আমি বাড়ী যাইতে চাহি না, তাহারা আমায় ঘৃণা করিবে, আমি যে কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে আমায় কুলত্যাগিনী বলিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবে; আমি অবলা, না বুঝিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছি। রমণীর যাহা গর্ব্বের, যাহা স্পর্দ্ধার, যাহার বলে আমি সগৌরবে তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রয়াস করিয়াছিলাম, তাহার উপরই যখন আমার কলঙ্ক রেখাপাত হইয়াছে, তখন আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন কি? আমার বিষয় তাহারা ভোগ করুক; তাহারা আর আমার কোন খবর লইবে না, আর যে নরপিশাচ আমায় এমন অবস্থায় ফেলিয়াছে; সে আর তথায় নাই, নিশ্চয়ই অন্যত্র পলাইয়াছে, এ অবস্থায় লোকে ভাবিবে, আমি ব্যভি-চারিণী, তাই তাহার সহিত পলায়ন করিয়াছিলাম।

ইহা শুনিয়া যুবক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "বড়ই সমস্যার বিষয়, তুমি রমণী-সুলভ চপলতাবশতঃ বড়ই অন্যায় করিয়াছ। হায়! জানি না, কোন্ মদিরায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ অতুলনীয় হিন্দু ললনার পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্মবিলোপে প্রয়াসী হয়, জানি না—তাহাদের প্রবৃত্তি কতদূর হেয়। মা! তোমরাই যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একমাত্র গৌরবের সামগ্রী, তোমাদিগের শোচনীয় অধঃপতনে বাঙ্গালীর উচ্চ শির অবনত হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালায় প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ইহা বুঝা উচিৎ।"

ইহা শুনিয়া শ্যামাঙ্গিনী কহিল, "বাবা, আপনি আমার একটা গতি করুন, এ অধঃপতিতা অসহায়া নারীর মুখ চাহিবার আর কেহ নাই, ভাগ্যবলে আমি আপনার দর্শন পাইয়াছি।"

যুবক কহিল, "আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি, মা! অর্থ-সামর্থ্য-হীন আমি যে অতি দীনদরিদ্র।"

শ্যামা। আপনি আমায় এ স্থানে অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা করুন, আমার ন্যায় অধঃপতিতার লোকালয় ত্যাগ করিয়া এইরূপ বনভূমিতে বাসই শ্রেয়।

যুবক। তুমি রমণী, অলোকসামান্যা রূপরাশি, তোমার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পূর্ণমাত্রায় বিকসিত, এ স্থলে তোমার অবস্থিতি করা আমি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি না, আমি জননীজ্ঞানে তোমায় কায়-মনপ্রাণে ভক্তি করিলেও, যদি কেহ তোমায় আমায় এই নিভৃত নির্জ্জন বনে দেখে, তাহা হইলে লোকে নানা কথা কহিবে।"

শ্যামা। আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি সংসারে নির্লিপ্ত, যিনি সংসারের মোহপাশ ছেদন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে লোকনিন্দার ভয় কেন? আপনি পিতা, আমি আপনার কন্যা—এই পিতা পুত্রীতে মিলিয়া আমরা পরস্পরে কার্য্যক্ষেত্রে সহায়তা করি আসুন। আপনার বাক্যে, উপদেশে আর আমার মৃত্যুকামনা নাই, এখন বুঝিয়াছি, কর্ম্ম—কর্ম্ম, এ কর্ম্মময় সংসারে সৎকর্ম্ম সাধনই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কে আপনি মহাপুরুষ, দীনদরিদ্রবেশে এই নিভৃত বনভূমিতে বাস করিতেছেন, দুহিতায় ছলনা করিবেন না; জানিবেন, যেদিন হিন্দু-সমাজে লোকে মাতাপুত্রে একত্রে অবস্থান করিতে দেখিলে হৃদয়ে কলুষভাবের প্রশ্রয় দিবে, সেদিন এ হিন্দু সমাজের অধঃপতন অনিবার্য্য। জগতে মাতৃনাম বড়ই সুখময়, স্নেহময়। আমি আপনার শরণাগতা

শিষ্যা বলিয়া, আমাকে আপনার জ্ঞানালোকদীপ্ত উজ্জ্বল পথের পথিক করিয়া নিন্, আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধন্য হই।

ইহা শুনিয়া যুবক কহিল, "মা! পুষ্পোদ্যানে কিশলয়শিরে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী সৌরভময়ী গোলাপসুন্দরী প্রস্ফুটিত হইলে, কেহ তাহাকে উত্তোলন করিয়া শ্যামা মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া থাকে, পরে সেই ফুল সযত্নে পবিত্রময়ী গঙ্গাবক্ষে পরিত্যক্ত হয়; আবার কেহ বা সেই গোলাপকে তুলিয়া দশজনের উচ্ছিষ্টা ঘৃণিতা বারনারীর কবরীর শোভা সংবর্দ্ধন করে, শুষ্ক হইলে তাহাকে অযত্নসহকারে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দেয়। কুম্ভকার একই মৃত্তিকাসংযোগে বিবিধ কুম্ভ প্রস্তুত করে, কেহ তাহা খরিদ করিয়া, তাহাতে অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া নারায়ণের ভোগ দেয়, আর কেহ বা তাহাতে পুরীষ বহন করে; গোলাপ ও কুম্ভের উপাদান এক, লোকের প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাহাদের উচ্চ ও অধঃগতি হইয়া থাকে। সংসার-কাননে নারী সর্ব্বসৌন্দর্য্যসারভূতা, কু ও সুপাত্রের হাতে পড়িয়া তাহাদের উচ্চ ও নীচ গতি হয়।"

শ্যামাঙ্গিনী করযোড়ে কহিল, "আপনি আমায় রক্ষা করুন, আপনার শিক্ষায় যেন আমার জীবন সার্থক হয়।"

যুবক ক্ষণকাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "নারায়ণ! এ তোমার কোন্ ছলনা প্রভো! কোথা হইতে তুমি এ অসহায়া রমণীকে আমার কাছে পাঠাইয়াছ, দয়াময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, আমার চিন্তা বৃথা; মঙ্গলময় তুমি, তোমার চরণ ধ্যান করিয়া আমি এ নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিলাম, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে, বিধিলিপি অলঙ্ঘনীয়।"

এইরূপ ভাবিয়া সে প্রকাশ্যে কহিল, "মা! তুমি যখন আমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছ, তখন আমি তোমায় ত্যাগ করিব না, তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পশ্চাদপদ

নহি ; মাতৃনামে, মাতৃজ্ঞানে আমি তোমায় এ স্থলে অবস্থিতি করিতে বলিতেছি। তুমি হৃদয়ে সর্ব্বদাই শক্তিসঞ্চয় করিবে, এ বনভূমির চতুর্দ্দিকেই বন্য পশুগণ অবাধে বিচরণ করে, তাহা দেখিয়া তুমি ভীতা বা সঙ্কুচিতা হইও না। তাহারা সকলেই আমার বশীভূত—এই দেখ,আমার ইঙ্গিতে তাহারা দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে। এ ভবসংসারে মানুষের উপকার করিলে, তাহারা তোমার কৃত উপকার ভুলিয়া তোমার অসময়ে তাহারা তোমার নির্য্যাতন করিতে পশ্চাদপদ হয় না, কিন্তু এ পশুগণের প্রবৃত্তি সেরূপ নহে, তোমার নিকটে ভালবাসা পাইলে পশুগণ তোমায় ত্যাগ করিবে না।"

অতঃপর যুবক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার "হর হর ব্যোম ব্যোম", শব্দ করিবামাত্র তথায় অসংখ্য শিবাদল ও কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক সানন্দচিত্তে তাহাদিগকে আহারীয় সামগ্রী দান করিতে লাগিল, তাহাদিগের আহার শেষ হইলে যুবক তিনবার করতালিধ্বনি করিবামাত্র পশুগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ইহা দেখিয়া শ্যামাঙ্গিনী সবিস্ময়ে কহিল, "পিতা! এ আপনার কি রহস্য।"

যুবক বলিল, "আমার সঙ্গে এস, তোমায় আরও কিছু দেখাইবার আছে।" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে শ্যামাঙ্গিনী তাহার পশ্চাদনুধাবন করিল। তাহারা প্রস্থান করিলে পর, পথিমধ্যে অবস্থিত সেই হাবা সাহেব এ স্থলে উপস্থিত হইয়া অঙ্গসঞ্চালনে যুবকের কার্য্যকলাপের আলোচনা করিতে লাগিল, তার পর অতিশয় প্রচ্ছন্নভাবে শ্যামাঙ্গিনীর অনুসরণ করিল। যুবক বা শ্যামাঙ্গিনী হাবার বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যুবকের কার্য্য

শ্যামাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া যুবক আর একটি পর্ণকুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহার চতুর্দ্দিকে কুকুর ও শৃগাল ইতস্ততঃ শায়িত ছিল। তথায় উপনীত হইয়া যুবক কহিল, "মা, এই যে কুটীরখানি দেখিতেছ, লোকে জানে, ইহা শৃগাল কুকুরের আবাসস্থল। কিন্তু ইহা সে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত নহে, ইহাতে আছে নিরাশ্রয়, ব্যাধিপ্রপীড়িত অসহায় নরনারী, যাহারা যৌবনে নানারূপ দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে, রোগে শোকে জর্জ্জরিত, আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত, সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত, চলচ্ছক্তি বিরহিত—তাহাদের আমি এ স্থলে আনিয়া আমার সামান্য শক্তি অনুযায়ী সেবা করিয়া থাকি।" অতঃপর সেই গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া এক ব্যাধি পীড়িতা নারীকে দেখাইল, তখন সে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল; যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মা! এই যে স্ত্রীলোককে দেখিতেছ, এ-ও কোন যুবকের দ্বারা প্রলোভিতা হইয়া কুলত্যাগিনী হইয়াছিল, যৌবনের উদ্দাম-উত্তেজনায় এ অভাগিনী ভবিষ্য-জীবনের ছবি অঙ্কিত করিবার একবারও অবসর পায় নাই, নারীর যৌবন—যাহা পদ্ম-পত্রে বারিবিন্দুর ন্যায় অস্থির, সামান্য ব্যাধিব্যাতায় যাহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই এক-মাত্র যৌবনের গর্ব্বে কত শত পুরমহিলা বিপথগামিনী হয়। দেখ মা! কুলত্যাগিনী রমণীর কি ভীষণ পরিণাম দেখ! পাপপথে পদার্পিতা

হইবার পর ইহার কিছুদিন বেশ আনন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল, তার পর দুশ্চিকিৎস্য, নানা ব্যাধিগ্রস্তা হইলে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার যৌবনাবস্থায় যাহারা নিত্য-সহায় ছিল, তাহারাই অসময়ে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, অনাথিনী সহায়সম্পদ স্বাস্থ্যহীন হইয়া পথে পথে কিছুদিন ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তার পর ব্যাধি বৃদ্ধির সহিত ইহার সে শক্তিও লোপ হয়। ঐ দেখ কি ভীষণ ক্ষত—ইহার সর্ব্বাবয়বে পরিলক্ষিত, নাসিকা গলিত, মুখমণ্ডল বিকৃত, হস্তপদ অসার।"

শ্যামাঙ্গিনী সে স্ত্রীলোকের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল, "কুক্ষণে আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, হায়! এ মহাত্মার আশ্রয় না পাইলে, না জানি আমাকেও কি বিপদে পড়িতে হইত?"

যুবক আর একটী স্ত্রীলোককে দেখাইয়া কহিল, "ঐ দেখ মা! আর একজনের অবস্থা দেখ, এও কোন কুলাঙ্গারের প্রতারণায় বৈধব্যাবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তার পর দৈববিড়ম্বনায় জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলে হতভাগিনী ধবল রোগাক্রান্তা হয়—তখন দশজনের ঘৃণিতা, পরের গলগ্রহ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে করে, শেষে বাতরোগে ইহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে, উত্থান ও চলচ্ছক্তিবিরহিত অবস্থায় পথিমধ্যে মৃতকল্পভাবে পড়িয়া থাকে, আমি ইহার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া এ স্থানে রাখিয়াছি।"

শ্যামাঙ্গিনী স্থিরদৃষ্টিতে তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাবিল, "এ নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ, ইহারই সুখের জন্য আমরা সতত প্রয়াস পাইয়া থাকি, কি ভীষণ অবস্থান্তর।"

যুবক আর একটু অগ্রসর হইয়া একটী বলিষ্ঠ পুরুষকে দেখাইয়া কহিল, "এই দেখ মা! এ হতভাগ্য পুরুষের পরিণাম দেখ, যৌবনকালে

এ ব্যক্তি স্বীয় দৈহিক বলের গরিমায় বহু নরনারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। পরস্বাপহরণ ইহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, যে অধর্ম্মাচারী, পাপপথের পথিক, তাহার পতন অনিবার্য্য, কালচক্রের ঘোর আবর্ত্তনে পড়িয়া দুরাত্মা, ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগের কবলে পতিত হয়, ক্রমে ক্রমে সেই ব্যাধি তাড়নায় ইহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল ; উপায়, বল, বুদ্ধিহীন অবস্থায় আমি ইহাকে এ স্থলে আনিয়া রাখিয়াছি।"

এইরূপে যুবক আরও দু'-একটী লোকের অবস্থা দেখাইয়া কহিল, "মা, এ কুটীরে এই সকল নিরন্ন ব্যক্তিদিগকে আমি লালিতপালিত করি। ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া, উচ্চ নীচ জ্ঞান হৃদয় হইতে তিরোহিত করিয়া, ইহাদের লালনপালনের ভার লইয়াছি, জানি না—ইহা ভাল কি মন্দ। ঈশ্বরের অনন্তকরুণায় আমি ইহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়া প্রাণে পুলক পাইয়াছি, আমার এ শরীর আগে এরূপ ছিল না—ইহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আমি দিন দিন বলিষ্ঠ হইতেছি। আমি দীন—অতি হীন—কিন্তু আমার কোন বিষয়েরই অভাব নাই, করুণাময়ের অনুকম্পায় আমি যাহা নিত্য উপার্জ্জন করি—তাহাতেই ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, কিছুরই অপ্রতুল হয় না, যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই নির্জ্জন বনভূমিতে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করি, আবশ্যক হইলে তাহা সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় ; সে সকল অর্থ রক্ষা করে এই অসংখ্য বন্য পশু, ইহাদিগের প্রতারণাপূর্ণ মানবের ন্যায় প্রবল অর্থলালসা নাই, সহজে পরের অনিষ্ট কামনা করে না, ক্ষুধার্থ হইলে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমার নিকটে ছুটিয়া আসে, আমি আহার্য্যদানে সকলের পরিতোষবিধান করি।"

এই সময়ে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি যুবকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া অতি কষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক কহিল, "বাবা, বড় তৃষ্ণা, জল, একটু জল দাও।"

সাগ্রহে যুবক তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিল, সে আকণ্ঠ ভরিয়া জলপানে সুস্থির হইল। অতঃপর যুবক শ্যামাঙ্গিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "মা, যদি তুমি আমার এই আশ্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা কর, যদি তোমার কুটীল সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া থাকে, যদি তোমার পরহিতসাধন করিবার কণামাত্র স্পৃহা হৃদয়ে বলবতী হয়, তাহা হইলে এস মা! আজ হ'তে তুমি কায়মনোপ্রাণে ঈশ্বরের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া এই অনাথ অসহায়দিগের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হও।"

শ্যামাঙ্গিনী ভক্তিপ্লুতহৃদয়ে কহিল, "আমি কায়মনোপ্রাণে ঈশ্বরের নামে আপনার স্মরণ লইলাম, আপনার আদেশ আমি সর্ব্বতোভাবে পালন করিব।"

অতঃপর যুবক উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার "রামশরণ, রামশরণ" বলিয়া ডাকিল, ক্ষণপরে একটী ক্ষীণকায় এক চক্ষুহীন যুবক আসিয়া কহিল, "কি আজ্ঞা গুরুদেব ?"

যুবক কহিল, "রামশরণ! শোন, এই মহিলাকে আমি মাতৃজ্ঞানে এ বনভূমিতে স্থান প্রদান করিয়াছি। তুমি আমার একমাত্র সহচর, তোমার সহায়তায় আমি এই সকল নিরন্ন, পঙ্গু, ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর প্রাণে আনন্দদানে সক্ষম হইয়াছি; বাঙ্গালায় জানি না—কোন্ মদিরা-মোহে বিমোহিত হইয়া, বঙ্গীয় যুবকগণ বঙ্গসংসারের শ্রেষ্ঠতম রত্ন, রমণীকে বিপথগমনে সহায়তা করে। আজ হ'তে এ মহিলাকে তুমি আমাদিগের দলভুক্তা জানিবে, মাতৃজ্ঞানে ইহার সকল অভাব ও অভি-যোগ পূরণ করিতে কখনও দ্বিধা বোধ করিও না।"

রামশরণ কহিল, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

যুবক করযোড়ে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কহিল, "বল দাও হে নিশাপতি,

বল দাও হে স্তব্ধ সমীরণ, বল দাও গ্রহ উপগ্রহ তারকামণ্ডলী দেবদেবী কে আছে কোথায়, বল দাও হে বনভূমির পশুপক্ষীনিচয়, তোমাদের সমবেত বলে বলীয়ান হইয়া আমি যেন আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে কখনও পশ্চাৎপদ না হই।"

রামশরণ কহিল, "গুরুদেব! আমি আপনার দাস, আমরা উচ্চ কার্য্যে ব্রতী, ভগবান আমাদের সহায়; আসুন—রাত্রি অধিক হয়েছে, আমরা বিশ্রাম করি।"

"চল", বলিয়া রমণীর সহিত যুবক অন্যত্রে প্রস্থান করিল।

রামশরণ তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইল, অতঃপর সেই হাবা আসিয়া যুবকের পর্ণকুটীরগুলি বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিল, এবং অঙ্গভঙ্গি করিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিধবা-বিবাহ

সুরেন্দ্রনাথ যোগমায়ার বিবাহের আয়োজন করিলে পাড়াপ্রতি-বাসিগণ তাঁহার অশেষ নিন্দাবাদ করিতে লাগিল, তিনি নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য কাহাকেও অর্থে, কাহাকেও সামর্থ্যে বশীভূত করিয়া নানাস্থান হইতে পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ আনিয়া আজ স্বীয় বৈঠকখানায় এক সভা স্থাপন করিলেন। অর্থের দাস যাঁহারা, তাঁহারা সুরেন্দ্রের স্বাপক্ষে মত দিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পূজ্যপাদ বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের অনেক যুক্তি তর্ক দেখাইতে লাগি-লেন, এবং সুরেন্দ্রনাথ যে স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহের আয়োজন করিয়া সৎসাহসের পরিচয়দানে অগ্রসর হইয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অর্থ প্রাপ্তে পরিতুষ্ট ব্রাহ্মণগণ মস্তকের বড় বড় টিকি নাড়িয়া, হস্তে নস্যের ডিবা সজোরে ধরিয়া নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন নস্য পূরিয়া হাঁচিতে হাঁচিতে সুরেন্দ্রনাথকে কহিলেন, "স্বনাম পুরুষ ধন্য! দিন আপনার বিধবা কন্যার আবার বিবাহ দিন, আমরা মত দিচ্ছি।"

অপর একজন পণ্ডিত কহিলেন, "হাঁ, এ শুভ কার্য্যে বিলম্বের আবশ্যক নাই, শাস্ত্রের কথা "শুভস্য শীঘ্রং"। এ আপনার শুভ কাজ—যেরূপ দিন সময় পড়িয়াছে, এখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় দোষ নাই। আর বিধবা বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে।"

অপর পণ্ডিত কহিলেন,"না, কলিধর্ম্মবক্তা পরাশর মত দিয়াছেন,—

"নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র-বিহিত।"

কান্তিচরণ অঙ্গভঙ্গি করিয়া সানন্দে কহিল, "এই ত শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের এমন স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে, তবুও আপনারা চ'খের সাম্‌নে বালিকার বৈধব্য যন্ত্রণা দেখ্‌বেন।"

হরলাল কহিল, "কি অন্যায়—কি অন্যায়।"

সুরেন্দ্রনাথ একজন প্রবীণ প্রতিবাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মুখুয্যে মশাই, আপনি বয়সে প্রবীণ, বৃথা দেশাচারের দোহাই দিয়া শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিয়া, আমার এত পরিশ্রম বিফল করিবেন না, এই সকল মহানুভব পণ্ডিত, আমার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহে অভিমত দান করিয়াছেন, আমি বিধবার বিবাহ দিব।"

ইহা শুনিয়া মুখুয্যে মহাশয় কহিলেন, "না, তা হতে পারে না। এদেশে যে প্রথা প্রচলিত নাই—তাহা কখনও প্রচলিত হ'বে না।"

মুখুয্যে মহাশয়ের কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রের বিপক্ষ দল সমস্বরে কহিল, "বিধবা বিবাহ কখনও প্রচলিত হ'বে না।"

হরলাল কহিল, "খুব হ'বে।"

কান্তিচরণ কহিল, "কি! শাস্ত্রের অমর্য্যাদা, দেশদেশান্তর হ'তে ভাল ভাল পণ্ডিত এসেছেন, এঁদের অমর্য্যাদা? কি অন্যায়!"

একজন পণ্ডিত নস্যের টিপ নাসিকায় দিয়া কহিলেন, "রাগারাগী কেন, স্থির হ'ন—শাস্ত্রের কথা শুনুন;—

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াংজ্ঞানমুচ্যতে।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেব কলৌযুগে ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগে প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগে প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলিযুগে প্রধান ধর্ম্ম দান। দানের চেয়ে পুণ্য নাই, সুরেন্দ্র বাবুর এ কন্যাদান কার্য্যে আপনারা বাধা দিচ্ছেন কেন?"

ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি কহিল, "ঠাকুর, তোমার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রাখ, আমায় সোজা কথায় বল দেখি, সুরেন্দ্র বাবু যে কন্যাকে অগ্নি সাক্ষী ক'রে বাপ পিতমহ প্রভৃতির পবিত্র নাম নিয়ে একবার এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন, সেই দত্ত কন্যাকে কোন্ যুক্তিবলে আবার অপর পুরুষকে দান করতে চান। সকলের অসাক্ষাতে ভিখারীকে একটা পয়সা দিলে, সে পয়সায় যখন দাতার কোন অধিকার থাকে না, তখন এ কন্যাদান ত বৃহৎ ব্যাপার, এ কন্যার উপর সুরেন্দ্রনাথের আর কোন অধিকার নাই, ইনি পিতা—তার অভিভাবক। ধর্ম্মকর্ম্মে তাকে সাহায্য করতে পারেন, নিবেদিতা কন্যাকে আবার দান করা আমি ইহার পক্ষে মহাপাপ মনে করি।"

আর একজন প্রতিবাসী কহিল, "শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে;—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

সা মৃতা লভ্যতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

তিস্রঃকোট্যোহর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।

তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গলাভ করে, মনুষ্য-শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, সে তৎসমকাল স্বর্গে বাস করে।"

প্রতিবাসীদিগের মধ্যে আর একজন কহিলেন, দীর্ঘতমার নিয়ম স্থাপন এই ;—

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্।
মৃতে জীবতি যা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ আমি অদ্যাবধি লোকেতে মর্য্যাদা স্থাপিতা করিলাম, নারীর কেবল এক পতি হইবে, যাবজ্জীবন তাহাকে আশ্রয় করিবে, সেই পতি মরিলে কিম্বা জীবিত থাকিলে নারী অন্য নরকে প্রাপ্তা হইবে না। নারী অন্য পুরুষকে গমন করিলে নিঃসন্দেহে পতিতা হইবে।

ইহা শুনিবামাত্র সুরেন্দ্রনাথের আমন্ত্রিত একজন পণ্ডিত কহিলেন, "রামচন্দ্র—রামচন্দ্র—দীর্ঘতমার নিয়ম স্থাপনের কথা ছেড়ে দাও, কলিধর্ম্ম বক্তা পরাশরের মতে কাজ কর, নষ্টে মৃতে—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া মুখুয্যে মহাশয় কহিলেন, "রেখে দাও, তোমার 'নষ্টে মৃতে', আমাদের কথা ছেড়ে দিয়ে উনি পরাশরের এক নষ্টে মৃতে শ্লোক আওড়াচ্ছেন।"

আর একজন কহিল, "দেখ, আমাদের দেশে যা হয়নি, তা হবে না। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দেশাচারের উপর নির্ভর ক'রে চল।"

এইরূপে সেই স্থলে উভয় দলের মধ্যে নানা তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া কহিলেন, "দেখুন—তর্ক বৃথা, আমি নিত্য চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি, অসংখ্য বালবিধবা একাদশীর দিন উপবাসক্লিষ্টা হইয়া, এক বিন্দু বারিপানের জন্য মৃতকল্পাবস্থায় ছট্‌ফট্ করিলেও, নিষ্ঠুর সমাজ তাহার প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

দেখিতেছি—শত শত পুরমহিলা সমাজতাড়নে স্বীয় মান মর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়া বিপথগামিনী হইতেছে, অসংখ্য ভ্রূণ হত্যা, পুত্র কন্যা হত্যা করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করে না, নির্ম্মম নিষ্ঠুর সমাজ এ সকল কি দেখিয়াও দেখে না।"

মুখুয্যে মহাশয় কহিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ! যে সকল আর্য্যমনীষিগণ বহুকাল মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া, আমাদিগের সুখ-সম্পদ বিপদ আপদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অধুনা বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রয়াসীদিগের অপেক্ষা বহু গুণে গুণবান্; তাঁহাদের রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষায় উপেক্ষা করিয়া নবপ্রথা প্রচলন করিবার প্রয়াস পাওয়া—কেবল ধৃষ্টতামাত্র। হিন্দুর বিধবা ভোগবিলাস বিবর্জ্জিতা ধর্ম্মপরায়ণা ব্রহ্মচারিণী, সাধারণের পূজনীয়া। তাঁহারা যাহাতে না কোনরূপে বিলাসবিভ্রমে চিত্তনিবেশ করিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগের অভিভাবকগণের দৃষ্টি রাখা উচিত। স্বধর্ম্মে নিরত থাকিলে কি হিন্দু স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই যে পুণ্যের উজ্জ্বল আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া, পাপের পথ হইতে দূরে অবস্থিতি করিবে, তাহা সুনিশ্চিত। যাঁহারা ধর্ম্মভীরু, তাঁহারা কদাচ পাপপথে অগ্রসর হন না, পরস্ত্রী তাঁহাদের জননী সদৃশ, তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার অন্বেষণ করেন, তাঁহাদিগের চক্ষে হিন্দু বিধবা দেবী স্বরূপিণী।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "অবলা বিধবাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়, এ দুর্ব্বলের প্রতি সমাজের উৎপীড়ন আমার সহ্য হয় না।"

একজন পণ্ডিত কহিলেন, "ঠিক কথা, আমাদেরও ঐ মত।"

ইহা শুনিয়া একজন প্রতিবাসী কহিলেন, "বাবা, নারী আর এই

নাড়ী দুই সমান—এই আছে, এই নাই। রোগীর নাড়ী যেমন টপ ক'রে ব'সে যায়, তেমনি নারীর মনও খপ ক'রে বিগড়ে যায়, এত বাঁধাবাঁধিতেও যখন তাঁদের মন স্থির থাকে না, তখন আল্‌গা পেলে কি আর রক্ষা আছে?"

আর একজন কহিলেন, "ভায়া হে, পুরুষের স্ত্রীই শক্তির মূলাধার, "শিব"এর পাশ থেকে "ি" (ইকার) সরিয়ে ফেল্‌লেই "শিব" শব হ'য়ে গেল। স্ত্রীলোকের সহ্য কর্‌বার শক্তি আছে ব'লেই আর্য্যমনীষিরা তাদের এ কঠোর ব্রতপালনের ভার দিয়েছেন।"

সুরেন্দ্র সগর্ব্বে কহিলেন, "নির্ম্মম, নিষ্ঠুর আদেশ, অবলাদিগের পক্ষে অসহ্য"

মুখুয্যে মহাশয় কহিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ! বোঝ, মানবের দেহাভ্যন্তরে যে সকল রিপু আছে, তাহার মধ্যে কামই ভীষণতর; ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এ সকল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইলেও যাইতে পারে, কিন্তু কামের নিকট হইতে নিষ্কৃতিলাভ বড়ই দুঃসাধ্য। স্বভাবতঃ মানুষ মাত্রেই রিপু পরবশ হইয়া থাকে, যাঁহারা ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত ও চরিত্রবলে বলীয়ান্, তাঁহারাই রিপু জয় করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বত্যাগী পরম যোগী দেবদেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় হইয়াও কাম জয় করিতে পারেন নাই। এ হেন কাম রিপু জয় করিয়া যে সকল হিন্দু বিধবা, সংযম ব্রতাবলম্বিনী হইয়া জীবনযাপন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ভোগবিলাসে নিরতা করিবার জন্য, পত্যন্তর গ্রহণের উপায় অন্বেষণ করা, আমরা যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া মনে করি না। সুরেন্দ্রনাথ! ঐ যে অদূরে তোমার চক্ষের সমক্ষে শ্বেত বস্ত্র পরিধানা, আলুলায়িত কুন্তলা নিরালঙ্কারা জ্যোতিহীনা, বাঙ্গালার বিধবা অবস্থিতা রহিয়াছেন, উঁহার জন্য তুমি তোমার নিজের চরিত্র ও পবিত্র কার্য্যকলাপের উচ্চ

আদর্শে, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি করিতে প্রয়াস পাও, তাহা না করিয়া, তোমার হেয়তম চরিত্রের গুণে, বিধবার আদর্শ চরিত্র কলুষিত করিও না।"

ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; কহিলেন, "আপনার যুক্তি বৃথা, আমি এ সকল কথা শুনিতে চাই না, আপনারা দেখিবেন, আমি এই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে, সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করাইয়া বালবিধবাদিগের ইষ্টসাধন করিতে পারি কিনা; আমি পাত্র স্থির করিয়াছি, যোগমায়ার আবার বিবাহ দিব, তাহাতে আমি সর্ব্বস্বহারা হই, সেও ভাল।"

মুখুয্যে মহাশয় কহিলেন, "তোমাদিগের ন্যায় দুই-চারিজন সমাজদ্রোহীর কার্য্যে সুবিশাল হিন্দু সমাজের কোনও ক্ষতি হইবে না, অনেকেই হিন্দু ধর্ম্মত্যাগ করিয়া অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের কোনও অনিষ্ট হয় নাই, হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের ভিত্তি—অতীব সুদৃঢ়। উন্মাদ যেমন মহাসাগরের জলকে দুর্গন্ধ করিবার জন্য, নিজে সাগরবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলে, ক্ষণেকেই তরঙ্গমালা সমাকুল বারিধিতে মিলাইয়া যায়, সাগরের অতলস্পর্শী জল বিকৃত হয় না, সেইরূপ তুমি এ বারিধিতুল্য হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলন করিবার প্রয়াস পাইয়া সমাজকে কলুষিত করিতে অগ্রসর হইয়াছ, তোমার এ হীন কার্য্যে হিন্দুসমাজে কোন অপকার হইবে না, তোমার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই এ আশা দুরাশায় পরিণত হইবে। আমরা আর তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না, অচিরে তুমি সমাজচ্যুত হইবে।"

ইহা শুনিবামাত্র সুরেন্দ্রনাথের বিপক্ষ দল 'তোমায় অচিরে সমাজচ্যুত করিব,' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সুরেন্দ্রের স্বাপক্ষে যাঁহারা ছিলেন, তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ কহিলেন,

"আপনি পরাশরের মতে কার্য্য করুন, "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসুনারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

কান্তিচরণ কহিল, "আমরা শাস্ত্রের অমর্য্যাদা কর্‌ব না, কালই পাত্রকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌ব।"

হরলাল কহিল, "নিশ্চয়ই।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন,"দেখি, আমার অঙ্কুরিত আশালতা ফল প্রদান করে, না—অকালে শুকাইয়া যায়, মহাসাধনায় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি, সিদ্ধিলাভ আমার উদ্যম সাপেক্ষ।"

তোষামোদীরা কহিল, "অবশ্য—অবশ্য।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বহুরূপী

"শিবু! তুমি সত্য সত্য বিধবা বিবাহ কর্‌বে নাকি?"

"তুমি কি তামাসা ঠাওরালে, প্রমথ।"

প্রমথ কহিল, "আমার এ কাজটায় তত মত নেই, দেখ্‌ছ না—পাড়াশুদ্ধ লোক তোমার মামার উপর বিগ্‌ড়েছে, আর ওদিকে সুরেন্দ্রনাথ বাবুরও গতিক ভাল নয়, সকলে মিলে তাঁকে এক ঘরে কর্‌বার যুক্তি আঁট্‌ছে।"

শিবনাথ কহিল, "যার যা ইচ্ছা করুক, এ বিধবা বিবাহ আমি কর্‌বই কর্‌ব, মামা এক ঘরে হয় হোক্, আমি সম্পূর্ণ রাজি আছি। প্রমথ, তুই জানিস্ না, এ ঘরে বিয়ে হ'লে দু'শো রগড় পাব। প্রথমেই ত সুরেন্দ্র বাবুর বিধবা বয়স্থা কন্যা, দ্বিতীয় পাঁচ হাজার টাকা, এফ—এ পাশ করেছি, আরও কিছু খাঁই কর্‌লেই হ'ত; তা যাক্, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে। তৃতীয়তঃ সুরেন্দ্র বাবুর আর একটি মেয়ে আছে, সেটাকে তার শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে যায় না—একটু চেষ্টা কর্‌লে সেটাও পাওয়া যাবে, চতুর্থ শ্রীশ বাবুর একটা ছেলে ছিল, সেটা বিবাগী হয়েছে, শুনেছি—তার স্ত্রী খুব সুন্দরী, সেটাকেও বাগাতে পারা যায়। এই চতুর্ব্বর্গ ফলের প্রত্যাশায় এ বিধবা বিবাহ কর্‌তে রাজি হয়েছি, তা নৈলে শর্ম্মা কখনও এ কাজে ঘেঁস্‌ত না।"

প্রমথ কহিল, "বটে, বটে, তবে টোপ্‌টা বেশ গেঁথেছে বল।"

শিবনাথ কহিল, "এক রকম ত লেগেছে, এখন টাকাগুলো হাতে এলে বাঁচি। দেখ্‌—এফ, এ পাশ ক'রে অফিসে কাজের চেষ্টায় ত অনেকের উমেদারী করেছি, কিন্তু সেদিকে অষ্টরম্ভা, বামুনের বরাত দাদা, পাথর চাপা। কাজ হয়, আর সাহেব জবাব দেয়, কে জানে ভাই, আমার কেমন চাকরি কপালে সয় না, নেশা ভাং করা অভ্যাস, ও অফিসের বাঁধাবাঁধি সময়ের মধ্যে হাজির দেওয়া আমার পোষায় না।"

প্রমথ কহিল, "চল্, একটু খাঁটি খেয়ে আসি, তোর বাপ ওকালতী ক'রে অনেক রোজগার করেছে, তোর চাক্‌রি না কর্‌লেও চল্‌বে এখন।"

শিব। না ভাই—দু'-একদিন একটু সাম্‌লে চলি, খাঁটি খাওয়ার দোষে দু'-এক জায়গায় সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছিল, আমার মামা বড় বদ্-রাগী, সে বেটার হাতে বিষয় পড়েছে, টাকা খরচ কর্‌তে চায় না। অনেক চালাকি ক'রে নেশার খরচ যোগাড় কর্‌তে হয়।

বৈশাখ মাস। সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী, পশ্চিমগগণে প্রকৃতি সতী লোহিত বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাকে বিদায়োভিনন্দন করিতেছেন, এমন সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ গোলদীঘীতে শিবনাথ ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিল। আর তাহাদের অনতিদূরে বহুরূপীর পরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তি মুখে নানারূপ রং মাখিয়া আশে-পাশে বাঁয়াতবলা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। শিবনাথ এই বহু-রূপীবেশী ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল, "প্রমথ! সে পাগলাটা শুয়ে আছে, চল, ওর কাছে না হয় কিছু ধার করা যাক্।"

বহুরূপীবেশী লোকটী এই স্থলে প্রায়ই বসিয়া গাওনা বাজনা করিত, লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া ডাকিত, সেও পাগলের মত নানারূপ রঙ্গরসিকতা করিত, এবং ভিক্ষা করিয়া বেশ দু' পয়সা অর্জ্জন করিত,

তবে তাহার মধ্যে একটি এই গুণ ছিল যে, সে সাধারণ ভিখারীর ন্যায় লোকের কাছে কিছু ভিক্ষা করিত না; তাহার ব্যবহারে, রঙ্গ-রসিকতায়, গীতবাদ্যে মুগ্ধ হইয়া যে যাহা তাহাকে দিত, সে তাহাই লইত। এমন কি তাহার কথাবার্ত্তায় অনেক সাহেব বিবি পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন, গোলদীঘীতে সাহেবেরা যখন হাওয়া খাইতে বহির্গত হইতেন, তখন অনেকেই এই পাগলকে স্বেচ্ছায় কিছু দান না করিয়া গৃহে ফিরিতেন না।

প্রমথ ও শিবনাথ যখন বিধবা বিবাহ করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফললাভের কথা কহিতেছিল, তখন সে তাহাদিগের কথা বেশ মন দিয়া শুনিতেছিল। এক্ষণে প্রমথ ও শিবনাথ তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে কহিল, "এই পাগলা, দেখি তুই কত রোজগার করেছিস্?"

পাগলার ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী অরক্ষিতভাবে তাহার সম্মুখেই পড়িয়া থাকিত, শিবনাথ সে সকল দেখিয়া কহিল, "ইস্, আজ যে অনেক রোজগার করেছিস্, আমাদের আজ কিছু ধার দিবি? কাল তোকে এর ডবল পয়সা দেবো, আজকের মতন তুই আমাদের মহাজন হ'।"

পাগলা কহিল, "তোমাদের দরকার হয় নাও; ইচ্ছা হয় ফিরে দিও, না হয় দিও না—কিন্তু বিধবা বিবাহ ক'রে অমন চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভ কর্‌বার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ ক'রো না।"

এই কথা শুনিয়া শিবনাথ কহিল, "আরে গেল, সে সব কথা তুই শুনেছিস্—তা দেখ্, ও সব কথা যেন কাউকে বলিস্ না, আমার বিয়ে হ'লে তোকে ভাল ক'রে খাইয়ে দেবো।"

পাগলা মাথা নাড়িয়া বাঁয়াতাব্‌লা বাজাইয়া কহিল, "তানে গরজে

প্রমথ কহিল, "এটা আস্ত পাগল, থাকে থাকে কখনও জ্ঞানের

কথা কয়, আবার কখনও বা পাগলামি ক'রে। চল্ শিবনাথ! এ পাগলাকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।"

পাগলা মাথা নাড়িতে নাড়িতে বাঁয়াতবলায় ঘা দিয়া কহিল, "ঝিঝি কাটি ঝিঝি কাটি ঝাঁ, তানি কাটি তানি কাটি তাঁ।

শিবনাথ কহিল, "ওরে, এ পাগল আবার তানি কাটি, ঝিঝি কাটি কি ব'লে? এই পাগলামি রাখ্, একটা গান গা দেখি, আমরা আর তোর পয়সা চাই না, তুই আবার পয়সা নিলে দুঃখ কর্‌বি।"

পাগলা কহিল, "পয়সা নাও, তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু তোমরা কখনও যেন কারও নিষ্কলঙ্ককুলে কালি দেবার চেষ্টা ক'রো না—জেনো, মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন, পাপের শাস্তি তিনি দেবেনই।"

ইহা শুনিয়া প্রমথ হাস্যসহকারে কহিল, "ওরে শিবে, এ পাগলা আবার ঈশ্বর দেখায়।"

শিবনাথ কহিল, "এই তুই ঈশ্বর মানিস্? আমরা ঈশ্বর ব'লে একটা কিছু আছে, এ কথা বিশ্বাস করি না, কই বাবা, অনেক যোগী-ঋষি ত তপস্যা কর্‌ছে, কেউ কি ঈশ্বর দেখেছে?"

প্রমথ কহিল, "সে মান্ধাতার আমলের কথা ছেড়ে দে, ঈশ্বর থাক্‌লে একদিন-না-একদিন তার দেখা পেতেমই পেতেম।"

পাগল হাসিয়া কহিল, "দেখ, আমার পা গোল নয়, তবু তোমরা আমায় পাগল পাগল করে পাগল বানিয়েছ, আর তোমাদের মাথার ভিতরে যে এত গোল—তবু তোমরা ভাল মানুষ।"

প্রমথ। তুই পাগল নস্ত কি? ঈশ্বরকে দেখেছিস্?

পাগল। বাবা! একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বোঝ দেখি, যিনি বিশ্ব-স্রষ্টা, যাঁর সৃষ্ট ঐ অসীম তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য, যাঁহার প্রতি তুমি তিলার্দ্ধ কাল দৃষ্টিনিক্ষেপ কর্‌তে পার না, সেই সূর্য্যের নিয়ন্তা যিনি, তিনি এ

সূর্য্য হ'তে কত তেজীয়ান ? তাঁর তেজে আমরা পাছে ভস্ম হ'য়ে যাই, সেইজন্য মঙ্গলময় ঈশ্বর জীবের মঙ্গলের জন্য সকলের অলক্ষিত হ'য়ে আছেন।

ইহা শুনিয়া শিবনাথ কহিল, "এটা কে বল দেখি, যাদু জানে বুঝি, সত্যি সত্যি আমার মাথা গুলিয়ে গেল ; পাগলা ! পাগলা ! তুই ঠিক বলেছিস্, ঈশ্বর না জানি, এ সূর্য্যের চেয়ে কত তেজস্কর—কে জানে, জগতে তার অবস্থিতি কোথায় ?"

পাগলা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া 'তানে গরজে মা' বলিয়া বাঁয়া তবলায় কয়েকবার ঘা দিল, তার পর গাহিল ;—

গীত।

কে জানে (কখন) কেমনে কোথায় আছে সে।
আমি এত বেড়াই খুঁজে (তবু) দেখা পাই না যে ॥
সঠিক তার নাই ঠিকানা
নর কি নারী যায় না জানা
কভু মুখে বলি রাম, কভু বা রহিম,
কভু কৃষ্ণ, কভু কালী, সাকার অসীম,
নিরাকার বলি আবার, তত্ত্ব নিরূপণ করে কে,
যত ভাবি, তত ডুবি, ঘোর অনন্ত তিমির মাঝে ॥

গান শুনিয়া প্রমথ কহিল, "পাগলা, তুই আবার গা, আমরা আজ আর খাঁটি খেতে যাব না, তোর গানই শুনি, তোর কথাতে আমাদের তোর উপর ভক্তি হয়েছে, তুই কে ভাই ?"

পাগল কহিল, "আমায় কেউ পাগল বলে, কেউ বহুরূপী বলে, কেউ গাধা বলে, কেউ উল্লুক বলে, যার যা প্রাণ চায়, সে আমায় তাই

বলে, কিন্তু সকলেই আমায় মায়া করে। যখন আমি দেশ-বিদেশে রাস্তায় ব'সে ভিক্ষা করি, তখন রৌদ্রের প্রখর তেজে আমার সমস্ত দেহ ঝলসে যায়, সেই সময়েই আমার মনে হয়, যে যিনি এ সূর্য্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা,না জানি তিনি এ সূর্য্যের অপেক্ষা কত গুণ তেজস্কর।"

শিবনাথ কহিল, "তুই ঠিক্ ঠাউরেছিস্, ঈশ্বর স্থূলরূপে বিরাটাকার, সে আকার এত বড় যে, পাছে আমরা দেখ্‌লে মূর্চ্ছা যাই, তাই তিনি কাহাকেও দেখা দেন না। তিনি আবার সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে আমরা তাঁকে চর্ম্ম-চক্ষে দেখ্‌তে পাই না। পাগলা, পাগলা তুই আমার মন ফিরিয়েছিস্, আর আমি পাপ চিন্তায় মন দেব না, বিধবা বিবাহ কর্‌ব ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছি—এ বিধবা বিবাহ কর্‌ব, চতুর্ব্বর্গ ফললাভের দুরাশা আমি ত্যাগ কর্‌লেম।"

পাগল কহিল, "বেশ কর্‌লে ভাই, তোমাদের কথায় আজ আমার বড় আনন্দ হ'ল ; আমাদের যখন কারও ভাল কর্‌বার ক্ষমতা নাই, তখন লোকের মন্দ করি কেন ভাই ? বাঙ্গালীর মেয়েদের বেচাল দেখ্‌লে, তাদের সতর্ক কর্‌বার চেষ্টা কর, অধর্ম্মের পথে তাদের নিয়ে গিয়ে বাঙ্গালীর উন্নত শির হেঁট করিও না।"

শিব। না ভাই, তুই সুখে আছিস্, তোর প্রাণ সাদা, পরের ভাবনা ভাবিস্, আমরা কেবল মনের গরমে নিজের কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

পাগল কহিল, "আমি যে পাগল, পরের ভাবনা ভাবি ব'লে পরে আমার আহার যোগায়, আমি এর চেয়ে পাগল হ'লে লোকে আমায় বোধ হয়, আরও যত্ন কর্‌ত।"

প্রমথ কহিল, "তোর কথায় লোক মজে যায়, তুই যাদু জানিস্, গা ত ভাই! তোর সেই শ্মশানের গানটা একবার গা ত।

পাগলা বাঁয়াতবলা বাজাইয়া বলিল, "ঝিঝি কাটি ঝাঁ, তানি কাটি তাঁ।"

প্রমথ কহিল, "রাখ্ তোর পাগলামি রাখ্—এখন গা দেখি।"

পাগলা গাহিল।

গীত।

ঘৃণা তোমায় কে ক'রে শ্মশান।
তুমি রোগী-ভোগী রাজা প্রজা,
সুখী দুঃখী জিত বিজেতা,
জ্ঞানী, মূর্খ সকলেরি পীঠ স্থান॥
দ্বেষাদ্বেষী দলাদলি জাত্যাভিমান।
(ও যে) তোমার কাছে পায় না স্থান॥
শোক দুঃখ জরা আদি, ধরার অশেষ ব্যাধি,
ঘুচিয়ে তুমি নিরবধি, জীবে দাও নির্ব্বাণ॥
তোমার কোলে সতী শুয়ে, পরপুরুষের স্পর্শ ভয়ে,
হয় না কভু ঘৃণায় লাজে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ॥

পাগলের যখন দ্বিতীয় গান সমাপ্ত হইল, তখন সন্ধ্যারাণী তিমির বসনাবৃতা হইয়া ধীরে ধীরে ধরিত্রীবক্ষে অনন্ত আঁধার রাশি বিস্তার করিতেছিল, তাহা দেখিয়া শিবনাথ কহিল, "পাগলা, এখন সন্ধ্যা হ'ল, আমরা চল্‌লেম, আবার কাল আস্‌ব।"

পাগলা বাঁয়াতবলায় ঘা দিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "তানে গরজে মা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পিসী-মার উপদেশ

"পিসী-মা! তুমি কি সত্যই আমাদের ছেড়ে-যাবে?"

"এ ছাড়া আর যে উপায় দেখি না, মা! আমি বড় বৌদির কাছে যাব বটে, কিন্তু আমার মন তোমাদের কাছে পড়ে থাক্‌বে।"

তখন রাত্রি দশটা বাজিয়াছে, নক্ষত্র-খচিত-গগণে সুধাংশুদেব আপন স্নিগ্ধ করোজ্জ্বল বিকীর্ণ করিয়া জগতে যেন আনন্দধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, এমন সময়ে এক শয়ন কক্ষে বসিয়া অনুপমা ও যোগমায়া মহামায়ার সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিল, মহামায়ার কথা শুনিয়া যোগমায়া কহিল,"তুমি গেলে আমার কি হবে পিসী-মা?"

মহামায়া কহিল, "কিছু ভেবো না, তোমার বাপ যা করেন, তুমি স্থিরচিত্তে তা দেখে যাও, বাঙ্গালীর মেয়ে আমরা চিরপরাধীনা, স্বেচ্ছায় আমাদের কোন কাজ কর্‌বার উপায় নাই, এর ভিতরে থেকেই আমাদের কর্ত্তব্য নিরূপণ কর্‌তে হবে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে চল, তিনিই তোমার উপায় কর্‌বেন।"

যোগমায়া। বাবা যে আমার বিয়ের উদ্যোগ কর্‌ছেন?

মহামায়া। করুক, তুমি আমার কথা মত চ'লো; জেনো, মানুষের হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ, সে একটা-না-একটা জিনিষ ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে না। কেউ অর্থ ভালবাসে, কেউ ঝগড়া ভালবাসে, কেউ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ভালবাসে—সতী পতিকেই জীবনের সারসর্ব্বস্ব জানে, পুত্র কন্যা-হীন বিধবা আমরা, আমরা ভালবাসি ধর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম। হৃদয় সঙ্কুচিত

না করে, তথায় সর্ব্বজনীন প্রেমকে আহ্বান কর। প্রেমই ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রেম।

যোগমায়া। মা বল্‌ছিল যে, এ বিবাহ হ'লে আমরা এক ঘরে হ'য়ে থাক্‌ব, মেজ জ্যেঠা বাবু, ননী দাদা এরা পর্য্যন্ত আমাদের পর হ'য়ে যাবে। তুমিও আর এখানে আস্‌তে পার্‌বে না।

মহামায়া। তা ঠিক, তোমার বাপের ইচ্ছামতে কাজ হবে, তিনি যখন সকলের মত অগ্রাহ্য ক'রে নিজের জেদ বজায় রাখ্‌ছেন, তখন সকলেই তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

ইহা শুনিয়া যোগমায়া কহিল, "তোমার কথা আমি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, একটু ভাল করে বুঝিয়ে দাও।"

অনুপমা কহিল, "পিসী-মা, তুমিই আমাদের বল, বুদ্ধি, আশ্রয়, তোমার অদর্শনে আমাদের বড় কষ্ট হ'বে।"

"বালিকা তুমি? তোমার শ্বশুর বাড়ীর কেউ কোন খোঁজ খবর নেয় না, এ অবস্থায় তুমি বাপের মন যোগাও—কোন কথা ব'লো না, তার পর যখন তুমি আশ্রয় পাবে, তখন নিজে নিজের সম্ভ্রম রেখো, আমার উপদেশ স্মরণ ক'রে চ'লো। অনুপমা! সেখানে গিয়ে আমি ননীকে জামাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো, যাতে তিনি তোমায় সেখানে নিয়ে যায় তার চেষ্টা কর্‌ব, তুমি ভেবো না, এখন নিদ্রা যাও।" এই বলিয়া মহামায়া তাহাদিগকে ঘুমাইতে বলিল, যোগমায়া ও অনুপমা আর কোন কথা কহিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবা-বিবাহে জীবনচন্দ্র

জীবনচন্দ্রের সহিত কান্তিচরণের যেদিন পথে দেখা হইয়াছিল, তখন হইতেই জীবনচন্দ্র বিবাহ করা উচিত কি অনুচিত, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই, সে প্রথমে আন্দুলের মেসো মশাইয়ের উপদেশ লইবার প্রার্থী হইলে, তিনি বিধবা বিবাহের নাম শুনিয়াই জলিয়া উঠিয়াছিলেন, সে তাঁহার নিকট হইতে পলাইয়া আসিবার পথ পায় নাই। জীবনচন্দ্র আজ ননীগোপালের বাটীতে আসিয়া তাহার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, এবং সুরেন্দ্রনাথের বিধবা কন্যার পাণি-গ্রহণ করিলে তাহার একটা উপায় হইবে, এ কথাও বলিল। আরও বলিল, কান্তিচরণ ও হরলাল তাহাকে এ বিবাহ কার্য্যে সাধ্যমত সহায়তা করিবে। ননীগোপাল এ সকল কথা শুনিয়া কহিল, "জীবন! ঘটকের কথায় প্রত্যয় করিও না, তাহারা জগতের একটি অদ্ভুত জীব, ইহাদের দ্বারা আমাদিগের সমাজের কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বার্থপর কান্তিচরণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমায় এ বিধবার পাণিগ্রহণে উত্তেজিত করিয়াছে, এ কার্য্যে তুমি আর অগ্রসর হইও না, আমি জানি, কাকা বাবু শিবনাথের সহিত যোগমায়ার বিবাহ দিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন।"

জীবনচন্দ্র কহিল, "বটে, শিবনাথ রাজি হয়েছে।"

ননী। তার মামা ভগবতীচরণ মুরুব্বি—সে একটি অর্থ পিশাচ, টাকার লোভে এ কার্য্য করিয়াছে। শিবনাথও চরিত্রহীন, সোণায় সোহাগা সংযোগ হয়েছে।

জীবন। তবেই ত! কান্তি খুড়ো আমার মন খারাপ ক'রে দিয়েছে, বেশ ছিলেম—সেই ত প্রাণে পিরীত জাগিয়ে দিয়েছে।

ননী। কি হে—তুমি দেখ্‌ছি বিয়ের জন্য অধীর হয়ে পড়েছ—আগে ত তোমার মুখে বিয়ের নাম শুনি নাই।

জীবন। না—এখন একটু পিরীত করবার বাসনা হ'য়েছে, আর একা কতদিন রেঁধে খাব ভাই?

ইহা শুনিয়া ননীগোপাল কহিল, "জীবন, বাল্যে তুমি আমার এক ক্লাসের সহপাঠী ছিলে, আমি জানি, তোমার হৃদয় সরলতায় পূর্ণ। যদি তুমি এখন বিবাহ করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে এ বিধবা বিবাহ করিবার স্পৃহা হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেল। বাঙ্গালায় অসংখ্য কুমারীর অভিভাবক, কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত, তুমি নিজের পছন্দ মত পাত্রী সন্ধান করিয়া অনায়াসে এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিতে পার। জগতের সমস্ত জাতীর ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, হিন্দু বিধবার ন্যায় ত্যাগময়ী আদর্শ ললনার উপমা আর কোথাও পাইবে না, আমাদিগের জাতীয় গৌরব, জাতীয় মাহাত্ম্য, জাতীয় আদর্শ যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে ঐ বঙ্গের হিন্দু বিধবা। যে ব্যক্তি এ হেন বিধবার ধর্ম্ম সংরক্ষণে প্রতিবন্ধক আনায়ন করে, তাহাকে আমি হিন্দুর পবিত্র দেবী প্রতিমা ভঙ্গকারীর ন্যায়, সম অপরাধে অপরাধী মনে করি।"

জীবনচন্দ্র কহিল, "তবে কি এ বিধবা বিবাহ দেওয়া ভাল নয়, কান্তি খুড়ো যে বল্‌লে বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত হ'লে সমাজের ভালই হবে।"

ননীগোপাল কহিল, "জীবন! আমার মনে হয়, বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইলে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমাজের অনিষ্ট হইবার বিশেষ

সম্ভাবনা। ঐ যে অন্নক্লিষ্ট রোগ শোকপূর্ণ বাঙ্গালীর সংসারে, শত শত পতিপরায়ণা হিন্দুললনা, অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম ও নানাবিধ ব্যাধিপ্রপীড়িত স্বামীর মুখ চাহিয়া, কোনদিন এক বেলা, কোনদিন বা নিরম্বু উপবাসে জীবন অতিবাহিত করিয়া, পতিপদে মতি স্থিরপূর্ব্বক কায়-মনোপ্রাণে, তাঁহারই সেবা করিয়া আপনাকে মহা ভাগ্যবতী মনে করিতেছে, ঐ যে অন্তঃপুরবিহারিণী লজ্জাবতী কুলাঙ্গনাগণ, দুশ্চরিত্র স্বামীর অত্যাচারে নিপীড়িতা হইলেও, হিন্দু সমাজের ও ধর্ম্মের নামে তাঁহাকেই জীবনের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া, তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিতা রহিয়াছে; বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে, এই সকল রমণীদিগকে সমাজ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া, বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করা মহা সমস্যার বিষয় হইবে। সমাজে বিধবা বিবাহ চলিলে যুবতীর স্বামী বয়োবৃদ্ধ, কুচরিত্র, দীন দুঃখী হইলে তাহাকে বোধ হয় অপঘাতে মৃত্যুর করালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে। অধুনাতন যে সকল নারী পাতিব্রত্যগুণে গুণবতী আছেন, তাহাদের সে ভাব ধীরে ধীরে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে।"

জীবন। তবে সুরেন্দ্র বাবু এ কার্য্যে ব্রতী কেন? তিনি বলেন, বিধবা বিবাহ দিয়া তাঁহার কন্যাকে সুখী করিবেন।

ননী। ভুল, জীবন! তিনি মহা ভুল বুঝিতেছেন; বিধবার বিবাহ দিয়া তাহাকে দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি স্নেহ, ভক্তি, মায়া, মমতা বিতরণে একাগ্রচিত্তে তাঁহাকেই চিত্ত সমর্পণ করিবার উপদেশ দেওয়া বড়ই কঠিন। আমি দেখিয়াছি যে পুরুষ একবার পরদারগমনজনিত পাপ-পথে অগ্রসর হয়, সে জীবনে ক্রমশঃই হেয় হইতে হেয়তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, হিন্দু সমাজের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া উঠে। বিধবা বিবাহে নারী-দিগেরও এইরূপ অধঃপতন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; যত অল্প বয়সেই

আমাদিগের দেশের বালিকার বিবাহ হউক না কেন, যত অল্প বয়সেই তাহারা বৈধব্য সাজে সজ্জিতা হউক না কেন, তাহারা পূর্ব্ব পতির স্মৃতি কখনও হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারে না।? বিধবা বিবাহ হইলে তাহারা আপনাপন পূর্ব্ব স্বামীর রূপগুণ যশোযশের সহিত দ্বিতীয় স্বামীর রূপগুণের তুলনা করিবার সুযোগ পাইবে, এবং পরদার গামী পুরুষের ন্যায় তাহারা ক্রমশঃই অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইবে। যদ্যপি কোন নারীর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ ললাটের লিখন থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেও যে সে বিধবা হইবে না, এ কথা কে বলিতে পারে?

জীবনচন্দ্র ইহা শুনিয়া কহিল, "তুমি বেশ বলেছ, আর আমার পীরিতে কাজ নাই, নিজে রেঁধে খাব বাবা—সেও ভাল, কান্তি খুড়ো বেটা বড় দমবাজ—তার কথায় আমার প্রাণে পীরিত চেগেছিল—তোমার কথা শুনে আমার প্রাণের ময়লা কেটে পীরিত চটে গেল।"

ননীগোপাল কহিল, "যদি তুমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাক, তাহা হইলে আমি তোমার বিবাহের আয়োজন করিব।"

"আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, এখন আমায় ভাব্বার সময় দাও; আগে বুঝি, কারও সঙ্গে পীরিত করা ভাল, কি নিজে রেঁধে খাওয়া ভাল।" এই বলিয়া তথা হইতে জীবনচন্দ্র প্রস্থান করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়ে পিসী-মা

মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সুনীলগগনোপরি আদিত্য-দেব পূর্ণতেজে সদর্পে বিরাজ করিয়া হিমালয় কিরীট শীর্ষ হইতে পথের প্রত্যেক ধূলিকণা পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রফুল্ল আননে হাসিরাশি ফুটিয়া আনন্দের উৎস ছুটিয়াছে, বর্ত্তমান সুখে তিনি বিভোর, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার এখন তাঁহার অবসর নাই; এমন সময়ে ফুলকুমারী কিরণশশীর উপদেশ মত বস্ত্রাদি ছাদের উপর শুখা-ইতেছিল। সে সূর্য্যের প্রখরতেজে কাতর হইয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন আরও একটু বেশী করিয়া দিতেছিল। শ্রীশচন্দ্র অফিষে গমন করিলে পর, কিরণ প্রত্যহই ভবানীপুরে পিত্রালয়ে বেড়াইতে যাইত, তাহার অবর্ত্তমানে ফুলকুমারী সংসারের সমস্ত কার্য্য করিত, ইহাতেও কিরণ ফুলকুমারীর উপর সন্তুষ্ট হইত না, স্কুল হইতে আসিয়া কোন ছেলে দেরীতে খাবার পাইয়াছে, কেহ ঠিক সময়ে কাপড় ছাড়িতে পারে নাই, সেজন্য তাহাদিগের অসুবিধা হইয়াছিল বলিয়া কিরণের সমীপে সর্ব্বদা তিরস্কৃতা হইত। ইহাতে ফুলকুমারী হৃদয়ে দুঃখ ও কাতরতা অনুভব করিলেও পিসী-মার উপদেশে কিছু বলিত না, সে সকল অত্যা-চার নীরবে সহ্য করিয়া গৃহকার্য্যেই লিপ্ত থাকিত; আজ সে যখন বস্ত্রাদি রৌদ্রে দিতেছিল, এমন সময়ে মহামায়া তথায় আসিয়া কহিল, "মেজ বৌ, কোথায় গো?"

ফুলকুমারী তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "কে, পিসী-মা! মা তার বাপের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে।"

ইহা শুনিয়া মহামায়া কহিল, "সে ত প্রায়ই বাপের বাড়ী যায়—মেজ দাদাকে বলে? না, আপনার ইচ্ছায় যায়?"

ফুলকুমারীর কহিল, "বাবা বোধ হয়, জানেন না, সহিসকে মা বলে রাখেন। তারা দুপুর বেলা সেখানে রেখে আসে, আর আগে মাকে এখানে পৌঁছে, তবে বাবাকে আদালতে আন্‌তে যায়।"

মহামায়া কহিল, "আমার কাজ নেই মা ও সব কথায়! মাথার উপরে কেউ না থাক্‌লে বোয়েদের এমন দশাই হ'য়ে থাকে। যাক্‌, আমি একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেম—সন্ধ্যার সময় বড়-বৌ দিদির বাড়ী যাব, আর দেখা হয় না হয়। ছোট দাদার কাছে সকালে বিদায় নিয়েছি, একবার মেজ দাদার সঙ্গে দেখা করতে পার্‌লে হ'ত।"

ফুলকুমারী কহিল, "তুমি গেলে আমি একেবারে মরে থাক্‌ব, মাও নড়তে চড়তে কাজের খোঁটা দেবে, তুমি থাক্‌লে তোমার কাছে মনের দুঃখ জানিয়ে আমি সুখী হতেম। বিধাতা আমায় জীবন্মৃত অবস্থায় রেখেছেন, তাঁর আর খোঁজ পাওয়া গেল না।"

ইহা শুনিয়া মহামায়া কহিল, "তাঁর জন্য তুমি ভেবো না, কাল ভোর-বেলা আমি স্বপন দেখেছি, সাতকড়ি যেন আমায় পিসী-মা ব'লে ডেকে কাছে এল, কত কথা বল্‌লে। সে কুশলে আছে মা, কুশলে আছে।"

ফুল। আমিও কাল ঐ রকম স্বপন দেখেছি—তাঁর চেহারা দেখে আমি সুখী হলেম; বোধ হ'ল, তিনি আগেকার চেয়ে আরও সুখে আছেন, সে মূর্ত্তি গম্ভীর—আমি হৃদয়ে এঁকে রাখ্‌লেম।

ইহা শুনিয়া মহামায়া কহিল, "দেখ মা! সেই মূর্ত্তি তুমি দিবারাত্রি ধ্যানে দেখ, ঈশ্বর যদি দিন দেন, তা হ'লে আবার তোমার সুদিন আস্‌বে। তুমি নিজের স্বভাবগুণে সর্ব্বত্র জয়ী হ'বে। সতী রমণী তুমি! পতির বিরহে কোন কষ্ট অনুভব ক'রো না, মনে কর সাতকড়ি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য উচ্চ কার্য্যে ব্রতী হয়েছে, যতদিন না তাঁকে সাম্‌নে দেখ্‌তে পাও, ততদিন ধ্যানে দেখ। জেনো মা! সতী রমণীর

দেহে সকল দেবদেবীর তেজঃ বিরাজিত থাকে, সতীত্বই নারীর ভূষণ—সারসর্ব্বস্ব, তুমি কায়মনোপ্রাণে পতিকে ডাক, তোমার সকল বিপদ্ দূর হবে। সতীত্ব প্রভাবে রমণী সকলেরই বন্দনীয়া হয়; দেবতা, মুনি ঋষিরাও সতী রমণীর কোনও অনিষ্ট করতে পারে না। শোন মা! সতীত্বের প্রভাব শোন! একদিন মাণ্ডব্য মুনি ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিল, সেই স্থান দিয়া এক সতী রমণী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির বাসনা পূরণের জন্য, ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে স্কন্ধে করে নিয়ে যাবার সময়, মুনির দেহে সেই স্বামীর পাদ স্পর্শ হয়, ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে মুনি শাপ দিলেন যে, যে পতির প্রতি তোর এত অনুরাগ—তোর সেই স্বামী—সূর্য্যোদয় হ'লেই মৃত্যুর কবলে নিপতিত হ'বে। মুনির অভিশাপ শুনে সতী রমণী বল্‌লে, যে আমি পতিগতপ্রাণা,—যদি আমি সতী হই, যদি আমার পতিপাদপদ্মে মতি থাকে, তা হ'লে শোন মুনি! আমি বল্‌ছি, সূর্য্য আর আকাশে উঠ্‌বে না। সতীর কথা রোধ হবার নয়, সূর্য্যও উঠে না—তার স্বামীও মরে না,—শেষে দেবতারা পরামর্শ ক'রে মুনি ও সতীর পরস্পরের মান রক্ষা করেন। মুনির বাক্যে সতীর পতির মৃত্যু হ'লেও, দেবতার আশীর্ব্বাদে সে মৃত পতি পুনরুজ্জীবিত হয়।"

ফুল। কে সে সতী রমণী পিসী-মা!

মহা। সে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা, তার স্বামী লক্ষহীরা নামে এক বেশ্যার রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে পত্নীর কাছে সে ইচ্ছা প্রকাশ করে, সতী পতির কথা শুনে বিরক্ত না হ'য়ে, পতিকে স্কন্ধে ক'রে সেই বেশ্যার কাছে যায়, সেই বেশ্যা তার স্বামীর চৈতন্য সম্পাদন করে।

ফুল। ধন্য সে ব্রাহ্মণ কন্যা! আর ধন্য সে বেশ্যা, যে অধঃপতিত পুরুষের চিত্তবৃত্তিকে সুপথে নিয়ে যায়।

মহা। তাই ত বল্‌ছি, মা! হৃদয় সর্ব্বদা পবিত্র রাখ্‌বে, কুচিন্তা

পাপের বীজ, তাহাকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিও না। কুপ্রসঙ্গ, কুকথা, কুৎসিত আলোচনায় কখনও মন দিও না, প্রাণ থাকৃতে কখনও কুলটার সংসর্গে যেয়ো না, ধর্ম্মচিন্তায় জীবন-যাপন কর। যেমন প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার শীর্ষদেশে, অশ্বথের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে, একবার শিকড় প্রোথিত কর্‌তে পার্‌লে, তাকে সমূলে উৎপাটন করা সহজ সাধ্য হয় না, সেইরূপ আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে একবার পাপের বীজ স্থান পেলে তাকে সহজে দূর কর্‌তে পারা যায় না।

তাহারা যখন পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে কিরণশশী গাড়ী করিয়া পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিল, এবং মহামায়া ও ফুলকুমারীকে একত্র বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল। মৌখিক হাসি হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরঝি, কত-ক্ষণ এলে ?"

মহামায়া কহিল, "বেশীক্ষণ নয়, আজ আমি এখান থেকে যাব, তাই একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি। শুনলেম, তুমি বাপের বাড়ী গিয়েছ।"

কিরণ একটু কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "হাঁ, মা'র বড় অসুখ, তাই দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।"

মহামায়া কহিল, "অসুখটা কি ?"

কিরণ মহামায়াকে দেখিয়া মিছামিছি তাহার মায়ের অসুখের কথা বলিয়াছিল। এক্ষণে মনে মনে কহিল, "আ মর! এ আবার জ্বালাতে এসেছে, তাকে না ব'লে দেয়—বোধ হয়, এ বৌ ছুঁড়ী বলেছে যে, আমি প্রায়ই বাপের বাড়ী যাই।"

মহামায়া তাহাকে অন্য মনস্ক দেখিয়া কহিল "কি ভাবৃছ মেজ-বৌ ?"

কিরণ। ওঃ! তোমার কথার উত্তর দিতে ভুলে গিয়েছি, মা'র রক্ত আমাশয় হয়েছে, তাই মনটা খারাপ।

মহা। তা ভাই, তুমি প্রায়ই বাপের বাড়ী যাও, আর এ সময় বৌ একা ঘরে থাকে।

কিরণ। কে বল্‌লে, আমি রোজ যাই—বৌ-মা বুঝি?

ফুল। না মা, আমি বলিনি।

মহা। আমার ত চোখ আছে বৌ, আমি দেখেছি—তোমার জুড়িগাড়ীর আওয়াজ আমাদের কানে গেলেই জান্‌তে পারি। তা ভাই, তুমি গিন্নী-বান্নী হয়েছ—আমার ও সব কথা বলা মিছে, তবে তোমার চেয়ে বয়সে বড়, তাই বলা। যাক্, আজ মেজ দাদার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব মনে করেছি।

ইহা শুনিয়া কিরণশশী মনে মনে কহিল, "আর দেখা কর্‌তে দেওয়া হবে না, পাঁচখানা ক'রে লাগাতে পারে, পুরুষের মন বই ত নয়, হয় ত ওকে এখানেই থাক্‌তে বল্‌বে; তা হ'লে আমায় জ্বালিয়ে খাবে—অমনি অমনি বিদেয় করি।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "তুমি আজই যাবে? তা হ'লে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া দায়—তিনি আজ কোন মক্কেলের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাবেন, আস্‌তে রাত হবে।"

ফুলকুমারী কহিল, "এ কথা আমায় আগে বলনি ত মা, আমি যে তাঁর জন্য রাত্রের খাবারের আয়োজন করেছি।"

কিরণ। ভুলে গিয়েছিনু, তা হোক—সে খাবার না হয় ছেলেরা খাবে।

ইহা শুনিয়া মহামায়া কহিল, "তবে আমি এখন আসি, মেজ দাদাকে বোলো যে, আমি দেখা কর্‌তে এসেছিলেম।

—"তা বল্‌ব এখন," বলিয়া কিরণ অন্যত্রে প্রস্থান করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সংযম ভঙ্গ

শ্যামাঙ্গিনী যুবকের নিকটে আশ্রয় পাইয়া ভগবানের চিন্তায় চিত্ত-নিবেশ করিয়াছে। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দিয়া, ত্রিশূল হস্তে যোগিনী সাজিয়াছে। যুবক তাহার কামিনীর সাজ ত্যাগ করাইয়া এ ত্যাগময়ী যোগিনীর সাজে তাহাকে ভবানীর পূজায় নিযুক্তা করিয়াছিল। পূর্ব্বে যুবক সন্ধ্যার পর সেই বনভূমিতে প্রায়ই থাকিত, শ্যামাঙ্গিনী আসিবার পর হইতে তাহাকে পশুদিগের আহারাদি দানের সঙ্কেত প্রভৃতি বুঝাইয়া, যুবক এখন ঠিক সন্ধ্যার পর আসিত না, কোন দিন আসিতে রাত্রি হইত, আবার কোনও দিন একেবারেই আসিত না। তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রামশরণ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, যুবকের সাহায্যে রামশরণের অর্থের অভাব হইত না, সে দিনমানে আপনাদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত। যুবক শ্যামাঙ্গিনীর জন্য এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

আজ সন্ধ্যার সময় শ্যামাঙ্গিনী এই কালীর সন্নিকটে ধূপ, ধুনা, প্রদীপ প্রভৃতি রাখিয়া কৃতগললগ্নবসনে প্রণিপাত করিয়া কহিল, "মা বিশ্বজননি! এ অভাগিনীর হৃদয়ের ভক্তি গ্রহণ কর্ মা! আমি পতিতা, জপ স্তব কিছুই জানি না, তোমার পবিত্র নামের মহিমা বুঝিয়া ঐ চরণে শরণ লইয়াছি। মা করালবদনি! লোকে তোমার কাছে মেষ, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি বলি দিয়া পরিতৃপ্ত হয়, আমার সে শক্তি যে নাই মা!

সে বলির উপকরণও জানি না ; তবে আমার যে সামান্য শক্তি আছে, তাহাতেই তোমার চরণতলে এ নশ্বরদেহের শোণিত বিন্দু দিয়া তোমার পূজা করিতেছি। মহিষমর্দ্দিনি! নে মা, আমার বলি গ্রহণ কর।” এই বলিয়া শ্যামাঙ্গিনী বক্ষস্থলে ছুরি বিদ্ধ করিয়া শোণিতবিন্দু মায়ের চরণে দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক অন্যত্রে প্রস্থান করিল। এই সময়ে বনভূমির চতুর্দ্দিকস্থ পশুগণ উচ্চনাদ করিয়া যেন মায়ের পূজার সময় বাজনা বাজাইয়া উঠিল।

রামশরণ শ্যামাঙ্গিনীর এইরূপে মায়ের পূজা গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিয়া দেখিতেছিল, এক্ষণে সে মায়ের প্রতিমা সমক্ষে আসিয়া কহিল, “আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এ বেশ্যা—মায়ের পূজায় এর অধিকার কি? গুরুদেব! আমি আপনার দাস ছিলাম, আমার সমস্ত শক্তি আপনার চরণতলে নিয়োজিত ছিল, কিন্তু যেদিন হইতে আপনি এ কুসুমকোরক তুল্য অনিন্দ্যসুন্দরীকে এ স্থলে আনিয়াছেন, সেদিন হইতে আমি বিচলিত হইয়াছি। রূপলাবণ্যের কি বিশ্ববিমোহিনী শক্তি! আমি কি উন্মত্ত? না—না—বিভ্রান্ত! কে এ কুহকিনী রূপের পসরা লইয়া আমার নয়নসমীপে দেখা দিয়াছে? আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি! এক চক্ষে আমি ইহাকে কত সুন্দর দেখিতেছি, না জানি দুই চক্ষু থাকিলে আমি ইহাকে আরও কত সুন্দর দেখিতাম। পাপীয়সী আমায় পাগল করিয়াছে, আমার এতদিনের সঞ্চিত সংযম তরুমূলে এ রমণী রূপ-কুঠারাঘাত করিয়াছে। মা! নৃমুণ্ডমালিনি! ক্ষমা কর, আমার অপরাধ নিও না। আমি একবারমাত্র ও রমণীকে চাই, তার পর আবার আমি তোমার পূজায় চিত্তনিবেশ করিব, ইহাতে যদি কেহ আমার প্রতিবন্ধক হয়, তা হইলে, তাহার নিস্তার নাই, শবাসনা! আমার বাসনা পূর্ণ কর মা!”

এই সময়ে শ্যামাঙ্গিনী তথায় একটি প্রদীপ হস্তে আসিয়া কহিল, "রামশরণ! একবার শীঘ্র এদিকে এস, যে কুষ্ঠ রোগীর মুখে আমি আহার্য্য দিচ্ছিলেম, সে খেতে খেতে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে, সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না, সেখানের আলো নিভে গিয়েছে, এই প্রদীপ জ্বালিয়ে এসে, দেখি তার কি হয়েছে।"

রামশরণ কালীর সম্মুখস্থ প্রদীপের শিখা হইতে শ্যামাঙ্গিনীর হস্তের প্রদীপ জ্বালিয়া কহিল, "তুমি তার মুখে জলের ছিটা দাওগে। তার ফিটের ব্যয়রাম আছে, জল দিলেই আরোগ্য হ'বে, আমি মাকে প্রণাম করে যাচ্ছি।"

ইহা শুনিয়া শ্যামাঙ্গিনী দ্রুতপদে চলিয়া গেল, রামশরণ স্থিরদৃষ্টে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আহা কি রূপ! ঐ অসামান্য রূপরাশি সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণেকের তরে, আমার এ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দান করিয়া গেল; এ রূপ-সুধা আমি পান করিব, একদিনের জন্য আমার বাসনা পূরাও মা, ভবানি! তার পর আমি যে রামশরণ ছিলাম—সেই রামশরণ হ'ব। কোন অপরাধ নিও না মা!" ইহা বলিয়া যেমন সে মার প্রতিমার সমীপে অগ্রসর হইবে, এমন সময়ে এক মৃত্তিকার স্তূপে সহসা হোঁচট খাইয়া ভূপাতিত হইল—আর তাঁহার মুখ হইতে শোণিত স্রোত বহিতে লাগিল। সহসা তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল, সে ক্ষীণদেহ ভবানীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রামশরণের অবস্থা দেখিয়া সেই বিজন বনমধ্যস্থ অট্ট হাসিনী, লোলজিহ্বা বিস্তারকারিণী, গলদেশে নরমুণ্ডমালা শোভিনী, অসিধারিণী ভয়ঙ্করী ভীমা করালবদনা কালী যেন আরও বিভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, তাঁহার ত্রিনয়ন হইতে যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইয়া রামশরণের সর্ব্বাবয়বে প্রতিফলিত হইল, দেবী যেন সত্যসত্যই [illegible] অট্ট

হাস্তে, সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলকেই গুরুদ্রোহী দুরাচারের দুর্গতি দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেছিলেন।

ঠিক এই সময়ে শ্যামাঙ্গিনী প্রদীপ হস্তে আসিয়া আবার রাম-শরণকে ডাকিল, কিন্তু তথায় কোন উত্তর না পাইয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে রামশরণের সেই দুরবস্থা দেখিতে পাইল; দেখিয়া শ্যামাঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "কি ভীষণ দুর্দৈব, ওদিকে সেই কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষের মুমূর্ষু অবস্থা, আর এদিকে এ রামশরণের কি দুর্গতি? একি! মুখ দিয়া শোণিত বহিতেছে, মা! এ তোর কি ছলনা? বিপদবারিণি! আজ আমায় এ কি বিপদে ফেল্‌লি মা? এ ঘোর বনে একাকিনী রমণী আমি, এঁদের জন্য কি করি? গুরুদেব! গুরুদেব! কোথায় তুমি, রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

"কি হয়েছে মা?" বলিয়া শশব্যস্তে যুবক সহসা তথায় উপস্থিত হইল।

যুবককে দেখিয়া শ্যামাঙ্গিনী কহিল, "গুরুদেব! আপনি এসেছেন? এই দেখুন, এদিকে আপনার প্রিয়তম শিষ্য এ স্থানে সহসা অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে, আর ওদিকে সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ মৃতপ্রায়, এ উভয় দিকেই বিপদ্।"

যুবক কহিল, "ভয় নাই, সে অভাগার অবস্থা মাঝে মাঝে অমন হয়,—আমি তথায় যাইতেছি, তুমি রামশরণের মুখে জল দাও। সম্মুখে আমাদিগের অভয়া রয়েছেন, "ভয় কি মা?"

ইহা শুনিয়া শ্যামাঙ্গিনী মার সম্মুখস্থ ঘট হইতে জল লইয়া রাম-শরণের মুখে সেচন করিতে লাগিল; আর যুবক সেই কুষ্ঠরোগীর সেবায় গমন করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ভগবতীচরণ

শিবনাথের সহিত যোগমায়ার বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। ভগবতীচরণ নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাইয়া আজ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন, তিনি বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া তামাক সেবনে মনোনিবেশপূর্ব্বক টাকাগুলি নাড়া-চাড়া করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, "আহা এ টাকার কি মধুর আওয়াজ! এর শব্দ ভাল, না—পাড়ার লোকের সেই গাধার মত চীৎকারে বিধবা বিবাহ দিও না'র শব্দ ভাল? টুং টুং—আহা মধুর শব্দ—প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল।"

এইরূপে যখন তিনি বসিয়া বসিয়া টাকা বাজাইতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় শিবনাথ আসিয়া কহিল, "মামা, টাকাগুলি আমায় দাও, একখানি গাড়ী কিন্‌ব।"

ভগবতীচরণ কহিলেন, "তা কিনো, কিন্তু বাবা ঘোড়া কিন্‌তে দিচ্ছি না—সে বড় ঝঞ্ঝাট। এ বেলা দানা খাওয়ায়, ও বেলা খাওয়ায়, সহিসের মাহিনা দাও—তার গা ডলাও, সে হবে না। তোমায় টাকা দেব, তুমি গাড়ী কিনে আন, বাড়ীতে রাখ—আর তার উপর চড়ে বাবুগিরি কর।"

শিবনাথ ইহা শুনিয়া কহিল, "সে কি, ঘোড়া না হ'লে গাড়ী চালাব কি ক'রে? একটা ভাল ঘোড়া চাই মামা!"

ভগবতী। সেটী হচ্ছে না, বাবা! সমঝে চল, ও ঘোড়া রোগে ধর্‌লে তোমায় বাঁচান দায় হবে, তোমার বাবার ঘোড়া ত কম ছিল না,—তিনি যেই ঘোড়া কিন্‌তেন, অমনি কিছুদিন পরেই মরে যেত—অনেক পয়সা খরচা হয়েছে বাবা, এখন সমঝে চল।

ইহা শুনিয়া শিবনাথ কহিল, "তবে আমায় দু' হাজার টাকা দাও, আমি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসি।"

ভগবতী। তা দিও, কিন্তু ব্যাঙ্ক বহিখানি আমার কাছে থাক্‌বে, তোমার যখন কিছু টাকা খরচ কর্‌বার দরকার হ'বে, আমায় জানিয়ে তবে খরচ ক'রো।

শিবনাথ মনে মনে ভাবিল, "হুঁ, ও সব বুজরুকিতে ভুল্‌ছি না বাবা, বিধবা বিবাহ কর্‌ছি টাকার লোভে, সে টাকায় তুমি কর্ত্তামী কর্‌বে, আর আমি তোমার মুখ চেয়ে থাক্‌ব—এ হবে না। নেশা চালাতে হবে বাবা, হর্‌দম নেশা চালাতে হ'বে।"

ভগবতীচরণ শিবনাথকে নীরবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া ভাবিলেন যে, সে কিছু নগদ টাকা হাতে না পাইলে এ বিবাহ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটা-ইতে পারে। ইহা বুঝিয়া কহিল, "কি বাবা, শিবনাথ! মুখটী ভার ক'রে রৈলে যে? বুঝেছি—আমার প্রস্তাব তোমার মনের মত হয়নি। এই নাও—এখন এক শ' টাকার নোট নিয়ে যাও, বাজে খরচ ক'রো না, তোমার বাবা মর্‌বার সময়ে আমায় হাতে হাতে তোমায় সঁপে দিয়ে গিয়েছেন, তোমার উন্নতি দেখ্‌লে আমি সুখী হ'ব, আমার ছেলেমেয়ে কেউ নাই; আপনি আর গিন্নী, যা আছে—তোমা-দের কল্যাণে এক রকমে রেখে ঢেকে যেতে পার্‌লেই ভাল।"

শিবনাথ টাকাগুলি হস্তগত করিয়া কহিল, "তা তুমি যা কর্‌বে, আমি তাতেই সুখী।" মনে মনে ভাবিল, "এ এক শ' টাকা আর ক'দিন? বিয়ের আগেই ফুঁকে দিচ্ছি, আরও কিছু বাগাতে হ'বে। আমার টাকা, এ মামা বেটা ফাঁকি দিয়ে ব'সে ব'সে খাবে; তা হ'বে না, বেগতিক দেখি—ভাগিয়ে দেব।" এই ভাবিয়া প্রস্থান করিল।

ভগবতীচরণ ভাবিতেছিলেন, "এ বিধবা বিবাহের হুজুকে পাঁচ হাজার

টাকা ত আদায় হয়েছে, তা নৈলে ও গুণধর ভাগ্‌নেকে কেউ হাজার টাকা দিত না। ছোঁড়া নেশায় ম'জেই আছে ; আমি দোক্তা, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিম, চণ্ডু এ সব নেশাতেই সন্তুষ্ট থাকি, ও ছোঁড়া আমাকেও টেক্কা মেরেছে ; স্থলপথ ছেড়ে জলপথে নেবে ঢকুঢকু চালিয়েছে। মরুকৃগে—ওর বরাতে যা আছে, তাই ঘট্‌বে। এই যে কান্তিচরণ ঘটকালির বিদেয় নিতে আস্‌ছে—আমার কাছে ও টাকা আদায় কর্‌বে ? আমি জাত, কুল, মান, সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে ভাগ্‌নের বিয়ে দিচ্ছি বিধবার সঙ্গে, আর তুমি ফাঁকতালে টাকা নেবে ?"

ভগবতীচরণ যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় কান্তিচরণ "রাধে রাধে" বলিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া ভগবতীচরণ কহিলেন, "কি মহাশয় ?"

কান্তিচরণ গলার আওয়াজ আর একটু চড়াইয়া কহিল, "রাধে, রাধে, বলি ভগবতী ভায়া সব আয়োজন ঠিক হয়েছ ত ? সুরেন্দ্র বাবু আমায় খবর নিতে পাঠাইয়েছেন, আর আমিও আমার প্রাপ্যটা নেবার জন্য এসেছি।"

ইহা শুনিয়া ভগবতীচরণ কহিলেন, "তোমার আবার প্রাপ্যটা কি শুনি ?"

কান্তি। রাধে রাধে ! সে কি হে ভায়া ? বলি ভুলে গেলে নাকি ? আমায় যে দু'শো টাকা দেবার কথা ছিল।"

ভগবতী মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার রাধে রাধের ভুল্‌ছি না বাবা ! তুমি দু' পয়সাও পাবে না।" প্রকাশ্যে সৌজন্যতা প্রদর্শন করিয়া কান্তিচরণকে হাতের হুঁকা দিয়া কহিলেন, "খাও—তামাক খাও।"

কান্তিচরণ রাধে রাধে বলিয়া সাগ্রহে হুঁকা লইয়া দু'এক টান দিয়া কহিল, "কি ভায়া ! চক্ষু বন্ধ ক'রে হুঁকায় টান দিচ্ছিলে নাকি ?"

ভগবতী। কেন—পুড়ে গিয়েছে?

কান্তি। এই রকম ত বোধ হচ্ছে।

"আচ্ছা, আমি আর এক কল্‌কে আনাচ্ছি।" বলিয়া ভগবতী দুই-একবার উচ্চৈঃস্বরে বেহারা বেহারা বলিয়া ডাকিল। বেহারা আসিয়া কহিল, "হুজুর!"

ভগবতী কহিলেন, "তামাক নিয়ে আয়।"

বেহারা কহিল, "পয়সা?"

ভগবতী। পয়সা কিরে—তামাক নিয়ে আয়।

বেহারা। আজ্ঞে—তাই আন্‌ব, পয়সা দিন, তামাক বাড়ান্ত হয়েছে।

কান্তিচরণের সমক্ষে "তামাক বাড়ান্ত হয়েছে," এই কথা বেহারার মুখে শুনিয়া ভগবতীচরণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "না, তোকে আর বাগ মানাতে পার্‌লেম না, তুই বেটা তামাক চুরি ক'রে আমায় ফেল কর্‌বি। পরশু দিন এক পয়সার তামাক কিনেছি—আজ আর নেই, আমি একটু তামাক খাই—তাই বলে কি এত খরচ বাড়্‌বে? তোকে জবাব দেব, জবাব দেব। আচ্ছা, এখন আর এক পয়সার তামাক নিয়ে আয়।" এই বলিয়া একটা সিকি পকেট হইতে বাহির করিয়া বেহারাকে প্রদান করিলেন।"

বেহারা সিকি লইয়া পস্থান করিতেছে, এমন সময়ে তাহাকে ডাকিয়া ভগবতীচরণ কহিলেন, "ওরে, তুই সিকিটা আমায় দে, বাড়ী থেকে একটা পয়সা নিয়ে যা, তুই আবার ভুলে বেশী কিনে ফেল্‌বি।"

বেহারা সিকি ফেরৎ দিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময়ে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া যাইতে ভুলিল না।

সে প্রস্থান করিলে ভগবতী কান্তিচরণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"কি জান ভায়া, লোকটার হাত টান আছে; বেশী পয়সা হাতে দিয়েছ কি, অমনি হিসাবে গোলমাল করেছে,নেশা ভাং ক'রে কি না! আমি যে মাহিনা দি, তাতে ও কুলিয়ে উঠ্‌তে পারে না, বেটা কেবলই উপরি রোজগারের চেষ্টায় ফেরে।"

কান্তিচরণ মনে মনে কহিল, "বাবা, তুমি যখন এক পয়সায় তামাক তিনদিন চালাও—তখন তোমায় আর চিন্‌তে আমার বাকি নেই। এখন ভালয় ভালয় কিছু আদায় হ'লে বাঁচি।" এই ভাবিয়া সে প্রকাশ্যে কহিল, "ও চাকরদের স্বভাবই এই রকম দাদা! ওদের কথা ছেড়ে দাও; রাধে রাধে! দাদা! আমার বিয়েটা হবে কি? তুমি ত সব টাকা বুঝে পেয়েছ, এই বেলা কিছু হ'য়ে যাক্; রাধে রাধে!"

ইহা শুনিয়া ভগবতীচরণ মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "তোমার কথাই ভাব্‌ছিলেম, একটা ফ্যাসাদে পড়েছি। ছেলে বিগ্‌ড়েছে, ব'লে আরও কিছু চাই—তবে বিয়ে কর্‌ব, পাত্রী বিধবা কি না?"

কান্তিচরণ বেশী পীড়াপীড়ি না করিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল, "তা ভাই, তুমি তাকে সন্তুষ্ট রাখ—আমার না হয়, পরে যা হয় করো—পাত্রকে সন্তুষ্ট রাখ। তবে আমি এখন আসি।"

ভগবতী। তামাক খাবে না?

"আর একদিন খাব," বলিয়া কান্তিচরণ প্রস্থান করিল।

ভগবতী ভাবিলেন, "মন্ত্র ধরিয়াছে, কান্তিচরণকে কলা দেখাইতে বড় বেগ পাইতে হইবে না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কিরণের কূট কৌশল

পূর্ব্ব স্থিরীকৃত মতে মহামায়া ননীগোপালের সহিত সুরেন্দ্রনাথের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলে বড়-বৌ তাহাকে অতি সমাদরের সহিত আপন গৃহে স্থান দান করিয়াছেন। মহামায়াকে বিদায় দিবার সময় হেমলতা কাঁদিয়া অধৈর্য্য হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ যে মনে মনে দুঃখিত না হইয়াছিলেন, এমন নহে; কিন্তু তিনি গাম্ভীর্য্যভাব ধারণ করিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। মহামায়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার কিছু পরেই শ্রীশচন্দ্র অফিস হইতে বাড়ী আসিলে, অমল তাঁহাকে তাড়াতাড়ি কহিল, "বাবা, বাবা—পিসী-মা বড় মা'র বাড়ী চ'লে গিয়েছে।"

শ্রীশচন্দ্র গৃহে কাপড় ছাড়িয়া পালঙ্কের উপর উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে কিরণশশী তথায় যাইলে পর শ্রীশচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"মহামায়া বড় বৌদিদির বাড়ী সত্যই আজ গিয়েছে ?"

কিরণ কহিল, "হাঁ, গিয়েছেই ত।"

শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "সে সেখানে গেল, একবার আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না ?"

কিরণ কহিল, "বৈকালে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে একবার এসেছিল,—এসেই যাবার জন্য তাড়াতাড়ি আর কি ? আমি তাকে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বল্লুম, তা সে অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, কত রাত্রে আস্‌বে—তার ঠিক নেই, মিছে সময় নষ্ট ক'রে কি হবে ?"

অমল কহিল, "বাবা, আমি পিসী-মার কাছে যাব, ননী দাদা বেশ পড়ায় আমি সেখানে একবার যাব।"

শ্রীশ। আচ্ছা, থাম্, আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, স্রোে-টাকে এক ঘরে কর্‌বে—বড় বৌয়ের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা যাক্।

কিরণ। ঠাকুরপোর যে জেদ—সেখানে আর মিছে গিয়ে কি হ'বে? ওদের দেনা-পাওনা সব চুকে গিয়েছে, বিয়ের সব ঠিক ঠাক হয়েছে, ঠাকুরপো এক ঘরে হ'তেই রাজি।

শ্রীশ। তাই ত—ভাইটের মাথা বিগ্‌ড়ে গেল?

কিরণ। সেজন্য আর তুমি ভেবে কি কর্‌বে বল! ননী আজ দু-এক কথা বলায় ছোট-ঠাকুরপো তার উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠল, ননী চুপে চুপে পিসী-মাকে নিয়ে গেল—তুমি আর কিছু বলো না, মিছে কেন অপমান হবে বল।

শ্রীশ। সুরেনের জেদের কথা সব শুনেছি, সে আমাকেও এ সম্বন্ধে কথা কইতে নিষেধ করেছে। জানি—আমার কথা থাকবে না, তবুও আমার প্রাণে বড় দুঃখ হচ্ছে; হাজার হোক ভাই, এক রক্তে আমাদের জন্ম, কর্ম্মগুণে আজ সে বন্ধন ছিন্ন হইতে চলিল; কি করিব! আমার ভাই বড়—না সমাজ বড়? দশজনকে লইয়া আমি সংসারী, দশজনের মুখ চেয়ে আমায় কাজ কর্‌তে হবে। রামচন্দ্র সমাজ-শৃঙ্খলা সংরক্ষার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন, আর আজ আমায় সমাজের মুখ চেয়ে ভাইকে ত্যাগ কর্‌তে হ'ল।

কিরণশশী স্বামীর হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিল, "তুমি ত আর ভাইকে ত্যাগ কর্‌ছ না, ভাই তোমাকে ত্যাগ কর্‌ছে। নাও ওঠ—এখন মুখে হাতে জল দাও।"

অমল কহিল, "তার পর আমাদের পড়া ব'লে দিতে হবে, কাল স্কুলে পড়া হয়নি, মার খেয়েছি।"

"তোদের অদৃষ্টে কষ্ট আছে, হরেশ মাষ্টারকে জবাব দিয়ে আর ভাল মাষ্টারই পাওয়া গেল না। সে অভিশাপ দিয়েছে, চল—পড়া দেখি। এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র মুখ হাত ধুইতে গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হরেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথের সংসার হইতে মহামায়ার প্রস্থানের কথা লইয়া পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যে বেশ আন্দোলন হইতে লাগিল, তাহাদিগের উপর মহামায়ার স্নেহ বড় অল্প ছিল না। সকলেই মহামায়ার কার্য্যগুণে বিমুগ্ধ ছিল; রোগীর শুশ্রূষা, বিপন্নের সহায়তায়, শিশুসন্তানদিগের আধিব্যাধি বিমোচনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পাড়ায় মহামায়ার সমতুল্যা ত্যাগময়ী রমণী আর কেহ ছিল না, এহেন মহামায়া পাড়া হইতে চলিয়া গেলে তাহার প্রসঙ্গ লইয়া যে প্রতিবাসীরা আন্দোলন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? লোকপরম্পরায় শুনিয়া সুরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা হরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রের সমাজচ্যুতি ও মহামায়ার কথা তাহার মাকে বলিল,তাহার মা স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রবধূকে নিজের বাটী লইয়া আনাই স্থির করিলেন; কিন্তু শ্বশুরালয়ে যাইবার পূর্ব্বে মহামায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হরেন্দ্রনাথকে তাহার পিতা অনুমতি করিলেন। তাহার মা কহিল, "মেয়েকে এইবার জন্মের মত এখানে আনা হ'বে,যাতে কিছু বেশী টাকা পাওয়া যায়—তার চেষ্টা দেখ।"

হরেন্দ্রনাথ অফিষের কেরাণী, তাহার মাসিক চল্লিশ টাকা আয় ছিল, পৈত্রিক সম্পত্তিও আছে; বৃদ্ধ পিতা গৃহে বসিয়া এখন দিনপাত করেন। হরেন্দ্র লেখাপড়ায় বেশ পারদর্শী, কিন্তু তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না; ঘোরতর মদ্যপায়ী—বারাঙ্গনা প্রেমাসক্ত ছিল। ইহাতে যে হরেন্দ্রের কেবল দোষ ছিল এমন নহে, তাহার এরূপ অধঃপতনের জন্য হরেন্দ্রের মাতাই অধিক দায়ী ছিল; কেন না, সে সুরেন্দ্রের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য, নিত্য নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া বৌ-মাকে গৃহে আনিত না, অথবা গৃহে আনিয়া অর্থ আদায়ের জন্য

বৌ-মাকে সর্ব্বদা বাক্য যন্ত্রণা দিত। গঞ্জনায় অস্থির হইয়া তাহার বধূমাতা শ্বশুরালয় অপেক্ষা পিত্রালয়ে থাকাই শান্তিপ্রদ মনে করিত, তাহার স্বামী সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে শান্তি পাইবার জন্য সুরা পানারম্ভ করেন। বারুণীর আনুসঙ্গিক নেশা বার নারী, যে একবার এই সংসার-সাগরে সুরা ও বারাঙ্গনা-প্রেমস্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তাহার গতিরোধ করা বড়ই সুকঠিন।

পিতামাতার উপদেশে হরেন্দ্রনাথ আজ বৈকালে ননীগোপালের পটলডাঙ্গাস্থিত বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাইবার সময়ে একটু সুরাপান করিয়াছিল, ননীগোপাল সহসা হরেন্দ্রকে তাহাদিগের বাড়ীতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। কেন না, সে নিজেই আজ পিসী-মার অনুরোধে হরেন্দ্রের সহিত দেখা করিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই হরেন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া ননীগোপাল যত্নসহকারে বসিতে বলিল, হরেন্দ্র তখন নেশায় ভরপুর; চেয়ারে বসিতে গিয়া পড়িয়া গেল। ননী-গোপাল তাহাকে তুলিয়া ঠিক করিয়া বসাইয়া দিয়া মনে মনে ভাবিল, "disgraceful, বড়ই লজ্জাকর—নেশায় লোকটা মাটি হ'য়ে গেল।"

হরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে জড়িতকণ্ঠে কহিল, "কি মাই ডিয়ার সম্বন্ধি! পড়ে গিয়েছি ব'লে আমার উপর ঘৃণা হয়েছে? জানি আমি, তুমি বিদ্বান—কিন্তু বাবা, এ রসে বঞ্চিত; তুমি ওকালতী করবার জন্য বই পড়ে মাথা গুলিয়ে ফেলেছ। একট আধট ঢক্ ঢক্ চালাও—দেখ্‌বে, মাথা সাফ হ'য়ে গিয়েছে

ননীগোপাল কহিল, "ও সব বাজে কথা ছাড়, এখন বাড়ীর সব খবর ভাল ত, তোমার শ্বশুর বাড়ীর খবর শুনেছ?"

হরেন্দ্র। হাঁ, সেইজন্যই ত তোমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি। কি ব্যাপার বল দেখি?

ননী। কাকা বাবু যোগমায়ার বিবাহের সমস্ত ঠিক করেছেন। তালতলার কেদার উকীলের ছেলে শিবনাথ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে তার বিয়ে হ'বে; নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন। দেশের সকল লোকের মত অগ্রাহ্য ক'রে,তিনি সমাজে বিধবা বিবাহ চালাবেন স্থির করেছেন, দেশের লোকও তার সঙ্গে আদানপ্রদান বন্ধ কর্‌ছেন। তিনি এক ঘরে হবেন. এই সব ভেবে আমি পিসী-মাকে কাল এখানে এনেছি।"

হরেন্দ্র। আমার কি করা উচিত?

ননী। তুমি তোমার পরিবারকে নিয়ে এস। কেবলই নেশায় দিন কাটাবে, পরের মেয়েকে গলায় করেছ; তার জন্য একটু ভাব—না—কেবল বেশ্যা নিয়েই পাগল হয়েছ।

হরেন্দ্র। তা হ'লে তুমি একবার আমার সঙ্গে যাবে, আমি তাকে নিয়ে আস্‌ব। সে সেখানে থাক্‌লে আমাদেরও লোকে এক ঘরে কর্‌বে।

"আচ্ছা, এইখানে একটু বোস। নেশা কেটে যাক্‌, তার পর বাড়ীর ভিতর যেও—একটু জলযোগ কর্‌বার পর সেখান হ'তে তোমার পরিবারকে নিয়ে যেও, আমি কাকী-মাকে বুঝিয়ে বল্‌ব—কাকা বাবুও বোধ হয়, কোন আপত্তি কর্‌বেন না; আমি এখনি আস্‌ছি।" এই বলিয়া ননীগোপাল বাড়ীর ভিতরে গেল।

হরেন্দ্রনাথ ভাবিল, "ননীগোপাল! বুঝিয়াছি; আমি বেশ্যাসক্ত, মদ্যপায়ী বলিয়া তুমি মনে মনে আমায় ঘৃণা করিতেছ; এমন কি বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইতেও দ্বিধা বোধ করিতেছ। ভাল, এ অপমানের প্রতিশোধ লইব; যেরূপেই হোক্‌, একদিন-না-একদিন আমি তোমায় বেশ্যালয়ে লইয়া যাইব; তখন তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। এ আমার জীবন পণ—দেখি, পারি কি হারি।"

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

পাগলার পাগলামি

আজ সন্ধ্যার সময় গোলদিঘীতে বসিয়া পাগলা আপনার মনে বাঁয়াতব্‌লা বাজাইয়া "তানে গরজে মা" করিতেছে, এমন সময়ে তথায় এক সাহেব আসিয়া তাহাকে দশ টাকা প্রদান করিলেন, পাগলা তাহাতে বিস্মিত হইল না। কেন না, সে সাহেবদিগের নিকট হইতে দু-পাঁচ টাকার কম ভিক্ষা পাইত না। সাহেব পাগলাকে টাকা দিয়া কহিলেন, "বোলো বোলো, তোম্‌রা ইংরাজী বাত বোলো।"

পাগলা সেলাম করিয়া কতকগুলা কথা বলিল, "Legrigati Khangracati Irawadi Admonition Benediction Emphatituation of the Gandalizing the Nationality, (লেগড়ীগেটী, খ্যাংরাকাটি, ইড়াওয়্যাডি, এডমনিসন, বেণীডিক্সন, এম্‌ফ্যাটিচুয়েসন অফ দি গ্যান্‌ডালাইজিং দি ন্যাসানালিটী।")

সাহেব শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আবার বোলো—আবার বোলো।"

পাগলা গম্ভীরভাবে আবার বলিল, "Itelchandi of the first grade of patriotism" (ইটেলচণ্ডী অফ দি ফাষ্ট´ গ্রেড অফ পেট্রি-য়টিজম) তাহার উচ্চারণ প্রণালী এত শুদ্ধ ছিল, যে লোকে শুনিলে তাহা বিশুদ্ধ ইংরাজী বা গ্রীক কিম্বা কোন নূতন ভাষা বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তাহার কোন ভাবার্থ ছিল না। সাহেবেরা তাহার ভাষা শুনিতে ভালবাসিতেন। উপস্থিত সাহেব পাগলের ইংরাজী কথা শুনিয়া কহিলেন, "May God give you long life, you are a blessing

to the country. জিতা রও—জিতা রও, তোম্ দেশকো মঙ্গল আছে।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সাহেব চলিয়া গেলে পর পাগলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া আবার বসিয়া পড়িল। তার পর কহিল, "এ খুব জবর সাহেব আছে, প্রায়ই আমায় দশ টাকার কম ভিক্ষা দেন না, ঈশ্বর ওঁর মঙ্গল করুন।"

অতঃপর তথায় প্রমথ ও শিবনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবনাথ পাগলাকে একটি টাকা দিয়া কহিল,"পাগলা একটা গান কর্ত ভাই।"

প্রমথ দশ টাকার নোট দেখিয়া কহিল, "ইস্! আজও যে বেশ দাঁও হয়েছে, দশ টাকার নোট কোথায় পেলি ?"

পাগলা কহিল, "এ এক সাহেব দিয়েছেন।"

প্রমথ। তুই বেশ আছিস্, পাগলামিতে খুব রোজগার হয় ত! আমরাও এবার পাগল সাজ্ব।

শিবনাথ কহিল, "পাগল সেজে ঘোড়ার ডিম খাস্, ও আপনার বরাতে খায়। পাগলা! গান কর ত ভাই—দেখ্, তোর কথায় আজও আমি নেশা করিনি।"

পাগলা কহিল, "বেশ বেশ, নেশায় কেবল শরীর নষ্ট হয়। তোমরা নেশা ছাড়—আমি তোমাদের কেবলই গান শোনাব।"

প্রমথ বলিল, "আরে পাগলা! নেশা ছেড়ে দেওয়া কি সোজা কথা, মনে কর্লেই হয় না।"

পাগলা কহিল, "মন দৃঢ় কর, খুব নেশা ছাড়্তে পার্বে।"

শিবনাথ কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন, তুই গান গানা।"

পাগলা

গীত।

ক্যা ফিরত হৈ ভুলানা দিন চার মে চলানা।
ক্যায়া কুটম্ব সব লোগ
ইহ জগ দেখ কৈ। ভুলানা॥
ধনমান মুল্ক ঘনেরে,
কহ করগয়ে বহুতেরে,
কিতনে যতন কর বঢ়ে
ঘট উত না ভুলানা।
হুঁসিয়ার হো দিবানে,
চলনা মঞ্জিল বিহানে,
বাকী রহে পৈ আবাজা
যম রাজাকা বুলানা।
লিখ্তে ঘড়ী ঘড়ী
কাগজ কলম বড়ী
এয়সা হুকুম সরকারকা
রহ দেত হুঁ উলানা॥

গান শুনিয়া প্রমথ শিবনাথের কাণে কাণে বলিল, "শিবে, চল্ এই-বার একটু টেনে আসি, বেশ গাঁ ঢাকা অন্ধকার হয়েছে।"

শিবনাথ কহিল, "তুই যা, আমি বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্মী ছেলে, এখন বাড়ী যাই—বিয়ে হ'য়ে গেলে পর দেখা যাবে।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

যোগমায়ার যন্ত্রণা

হরেন্দ্রনাথ ননীগোপালের সহিত শ্বশুরালয়ে গিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলে, সুরেন্দ্রনাথ বিনা আপত্তিতে জ্যেষ্ঠ কন্যাকে পাঠাইয়াছিলেন। ননীগোপাল সুরেন্দ্রনাথকে বেশ করিয়া বুঝাইয়াছিল যে, হরেন্দ্রের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে না পাঠাইলে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন তমসাচ্ছন্নময় হইয়া উঠিবে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহাকে পাঠান সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। সুরেন্দ্রনাথ ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, এইবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার শেষ-বিদায়, সমাজের কঠোর শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া হরেন্দ্রের পিতামাতা আর তাহাদিগের পুত্র বধূকে পিতৃভবনে পাঠাইবেন না। এইরূপ তিনি কন্যাকে উত্তম বসন-ভূষণ এবং তত্ত্বের জন্য উত্তম দ্রব্যাদি ও প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন।

ইহা দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহার মাতা ঠাকুরাণী এবার পুত্র বধূর আর বড় একটা নিন্দা করে নাই। ননী-গোপাল অনুপমাকে শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর প্রতি বিশেষ যত্ন, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণচিত্তে সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছিল। সে আরও বুঝা-ইয়াছিল যে, এইবার হইতে তাহাকে শ্বশুরালয়েই চিরজীবন অতি-বাহিত করিতে হইবে, আর পিত্রালয়ে আসিতে পারিবে না; তবে যদি সে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সময়ে সময়ে পিসী-মার সঙ্গে দেখা করিতে পারে, অথবা তাহাদিগের বাটীতে থাকিতে পারে।

অনুপমা শ্বশুরবাড়ী [illegible] পর যোগমায়ার সাথী আর কেহ রহিল না, সে [illegible] ভাবিতেছিল, "গেল— একে একে আমায় সকলে [illegible] পিসী-মাকে ছেড়ে আমি একদিনও থাকি [illegible] কথা নাই, প্রাণ বড়ই অস্থির

হয়েছে। হোক্,মন ধৈর্য্য ধর, হৃদয় প্রকৃতিস্থ হও! প্রবৃত্তি! তুমি আমার মন হইতে দূর হও। নিবৃত্তি! এস, তোমায় আমি যেন কখনও না বিস্মৃত হই। উদ্যম, উৎসাহ, এস! তোমরা সমবেতভাবে আমায় কর্ত্তব্য-পালনে সহায়তা কর। পিসী-মা! তুমি গিয়েছ, যাও—আমি তোমার উপদেশ মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে রেখেছি। বাঙ্গালীর মেয়ে চিরপরাধীনা, এই পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেও তাহাদের যশ দিগন্তব্যাপিনী। বাঙ্গালীর মেয়ে অভিভাবকের ইচ্ছায় রোগ শোকপূর্ণ, জরা ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধকে পতিত্বে বরণ ক'রে থাকে, বাঙ্গালীর মেয়ে আপন অভিভাবকের মান গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। সেই বাঙ্গালীর মেয়ে আমি, পিতার কার্য্যে আমার কোন কিছু বলবার অধিকার নাই। বোঝ মন! তোমার অবস্থা বোঝ! হৃদয়, স্পন্দনহীন হ'য়ো না; কঠোর হও, মহা কার্য্যে অগ্রসর হয়েছ—ধীরে—ধীরে চল। এই আমার সাদা ধপ্‌ধপে বসন, দু'দিন পরে আর পর্‌তে পাব না, এই নিরলঙ্কার দেহ, বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হবে—সেও অভিভাবকের ইচ্ছায়। বাঙ্গালীর মেয়ে অভিভাবকের বশবর্ত্তিনী, কিন্তু মন! তুমি আমার—অভিভাবকের অলক্ষিতে আমার হৃদয়-কন্দরে অবস্থিত—তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক। পিসী-মার উপদেশ বাক্য ভুল না, যেমন আছ, তার চেয়ে পবিত্র হও, কলুষিত হ'য়ো না। দয়াময়! বাঙ্গালীর মেয়ে আমি, তুমি আমার সহায় হও, সর্ব্বত্র বিদ্যমান তুমি, তোমার পূর্ণ জ্যোতিঃ দানে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পরিষ্কৃত কর, প্রভু!"

সে যখন এইরূপ ভাবিতেছিল,এমন সময়ে তথায় হেমলতা আসিয়া কহিল, "যোগমায়া, খাবি আয় মা! বেলা একটা বাজে, ভেবে আর কি করবি বল্।" এই বলিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিল।

যোগমায়া কোন কথা না বলিয়া হেমলতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

হরেশচন্দ্রের অবস্থা পরিবর্ত্তন

এ জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। কালচক্রের ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে পড়িয়া প্রকৃতির ঋতুনিচয় যেমন একটির পর একটি, তার পর আর একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মানবের অদৃষ্ট চক্রও সেইরূপ প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; আজ যিনি রাজা, কাল তিনি প্রজা, আজ যিনি ভোগী—দুগ্ধফেননীভ সুকোমল শয্যা ভিন্ন যাহার নিদ্রা হইত না। কাল তিনি যোগী হইয়া বৃক্ষতলে হস্তে মস্তক স্থাপন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কালের অপ্রতিহত প্রভাবে কাহারও কখন চিরদিন এক ভাবে যায় না, কালে সকলেরই মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ যে অদূরে শ্যামাঙ্গিনী পতি বিয়োগ-জনিত শোকে কাতর হইয়া, সময়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, একাগ্রচিত্তে পতির উদ্দেশে চিন্তা করিতেছে, কালে উহার এ বিষাদের ছায়া অপনোদন করিয়া দিবে। কালক্ষয়ে মানবের হৃদয়-কন্দর হইতে ধীরে ধীরে শোক, তাপ, বিষাদ অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

জগতে সকলেই সুখের জন্য লালায়িত—কয়জন স্বেচ্ছায় দুঃখ কামনা করে? স্বার্থ সাধনের জন্য জীব একজন অপরকে ভালবাসে, পতির স্বার্থ পত্নীর প্রতি অতি মাত্রায় পূর্ণ, সেইজন্য পতি পত্নীকে এত ভালবাসে, যেখানে এ স্বার্থের ব্যতিক্রম হয়, সে স্থলে ভালবাসা বিরাজিত হয় না।

মানুষ কাহাকেও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না, কেহ ভালবাসে নারীর চাঞ্চল্যবিধায়িনী অপরূপ যৌবন শ্রী, কেহ ভালবাসে অর্থ, কেহ ভালবাসে উপাদেয় আহার, কেহ ভালবাসে উত্তম-বসনভূষণ। যে এ

সকলের মধ্যে কোনটীকে ভালবাসিয়া প্রাণে আঘাত পাইয়া থাকে, সে তখন ধর্ম্মের দিকে ছুটিয়া যায়। আমাদিগের হরেশচন্দ্র এই শেষোক্ত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রের নিকট হইতে চাকুরী হারাইয়া তিনি এই ধনজনপূর্ণ মহানগরী কলিকাতায় কোনও চাকুরীর সংস্থান করিতে না পারিয়া বড়ই কষ্টে পড়েন। তাঁহার দিন চলা দায় হইয়াছিল, চক্ষের সম্মুখে দুঃখিনী মাতা, হৃদয়রঞ্জিনী ভার্য্যা, প্রাণের আনন্দদায়ক শিশুসন্তানগুলি অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইতেছিল, এ অবস্থায় পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার এক বন্ধু কোন কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন, সেখানে মহামারির প্রকোপ বাড়ে; হরেশচন্দ্র তথায় স্ত্রী, পুত্র ও মাতৃহারা হইয়া শোকে অধৈর্য্য হন। শেষে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে, তিনি সংসারসাজ ত্যাগপূর্ব্বক যোগীর বেশে, বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, আজ হাওড়া পোলের সন্নিকটস্থ তরতর প্রবাহিনী কল্লোলময়ী গঙ্গাবক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, "ঐ পূতসলিলা ভাগীরথীর ফেণোর্ম্মিমালার ন্যায়, আমি এ হৃদয়সাগরের বাসনা-তরঙ্গাভিঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, নানাদেশ পর্য্যটনের পর আজ জননী জন্মভূমির শ্যামল স্নিগ্ধ ক্রোড়ে ফিরিয়াছি। দেশবিদেশে দেখিলাম, ভারতের ঘরে ঘরে এখনও নরনারীকূল ধর্ম্মের নামে মাতোয়ারা, আমার যে উচ্চ শিক্ষা অন্ন সংস্থানের কোন উপায় করিতে পারে নাই, আমি স্বদেশে জীবিকা উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া মাতৃভূমির ক্রোড়ত্যাগ করিয়া, বিদেশে অবস্থিতি করিতেছিলাম। সে উচ্চ শিক্ষা, সে প্রশংসাপত্র, সে জীবিকা উপায়ের পন্থা অপেক্ষা এ গৈরিক বসন, রুদ্রাক্ষ মাল্য, ত্রিশূল ও বিভূতি এ ভারতভূমে আমার ন্যায় ব্যক্তির বিশেষ [illegible]। উচ্চ শিক্ষার গরিমায় চাকুরী স্বীকার করিয়া একদিন [illegible] শ্রীশচন্দ্রের সমীপে অপদস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু আজ 'আমার [illegible] সাজে

সকলেই ভক্তি বিগলিতচিত্তে আমায় প্রণাম করিয়া থাকে। আমি দীন—এ যোগী বেশ ধারণে আমার অন্ন চিন্তা ঘুচিয়াছে, স্বেচ্ছায় লোকে আমায় ভিক্ষা দেয়। হে যোগীবর ত্রিলোচন, ধন্য তুমি! তোমার বিভূতি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ, আমি তোমায় ভক্তিপূর্ণচিত্তে প্রণাম করি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হরেশচন্দ্র মহাদেবের ধ্যানে বসিলেন। অতঃপর তথায় জীবনচন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, "না, পিরীত আর করা হ'ল না, ও বাবা বিশেষ হাঙ্গামা, গরীবের ছেলে বেঁধে খাওয়া ভাল; দেখি, যদি কোথাও প্রেমের সন্ধান পাই।" এই বলিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া সেই যোগীবেশী হরেশচন্দ্রকে দেখিয়া কহিল, "এই যে এক সাধু পুরুষ দেখ্‌ছি, দেখি—এঁর কাছে যদি কিছু পীরিতের দাওয়াই থাকে। বাবা! পিরীতের নেশা বড় কম নয়, একদিন পীরিত পীরিত ক'রে, অন্ধকারে একটা ঘোড়ার চাঁট খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছি। কে এ যোগী? বিষম ধ্যানে মগ্ন দেখ্‌ছি। যেই হোক—একটা প্রণাম করি।"

হরেশচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া একটু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কে জীবন?"

জীবন ইহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, "কে এ সিদ্ধ পুরুষ? যোগবলে আমার নাম পর্য্যন্ত অবগত হয়েছেন। দেখা যাক্, সন্ধান করে, এঁর কাছে পিরীতের দাওয়াই থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।" প্রকাশ্যে করযোড়ে কহিল, "হাঁ প্রভু! আমি জীবন, আপনার অনুগ্রহলাভের প্রত্যাশা করি।"

হরেশচন্দ্র কহিল, "জীবন, ভাই, তুমি আমায় চিনিতে পার নাই, আমি তোমার সেই চিরপ্রিয় হরেশ। একদিন তুমি আমার দারিদ্রতাজনিত কষ্টে কাতর হইয়া, আমার অন্ন সংস্থানের জন্য এ মহানগরী

কলিকাতার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলে—কিন্তু কোন ফল হয় নাই।"

জীবনচন্দ্র সবিস্ময়ে কহিল, "হরেশ! ভাই, বন্ধু! তোমার এ সাজ কেন?"

হরেশচন্দ্র জীবনকে আপনার অবস্থা সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিল, কোনও কিছু গোপন করিল না। শুনিয়া জীবন কহিল, "বেশ! তবে ভাই আমিও তোমার সাথী হইব, তোমার মাতা, পুত্র, স্ত্রী নাই—আমিও এ সকলে বঞ্চিত, আমি পিরীত চাই না। প্রেম চাই—দাও ভাই, প্রেম দাও—প্রেমে মাতোয়ারা হই।"

হরেশচন্দ্র কহিল, "যদি প্রেম চাও, তা হ'লে এই ধর্ম্মকে ভালবাস, রূপে মোহ আছে—সে মোহ কেটে গেলেই পীরিতের গ্রন্থি ছিন্ন হয়। এ ধর্ম্মের প্রেম-প্রবাহ অটুট, অক্ষুণ্ণ।"

"ভাই! আজ হ'তে তুমি আমায় তোমার সাথী কর, আর আমি সংসারী নহি। আমার মা যখন ম'রে, সেই সময়ে আমার সংসারী হবার সাধও ঘুরে গিয়েছিল; তার পর কান্তি খুড়ো ফের আমার প্রাণে পীরিতের ঢেউ লাগিয়ে দেয়। আজ বাল্যের বন্ধু—যৌবনের সাথী—তুমি আমার প্রাণে ধর্ম্মের পুণ্য প্রেম-রেখাপাত করেছ। দাও ভাই! আলিঙ্গন দাও।" এই বলিয়া জীবনচন্দ্র হরেশকে বাহুযুগলে বেষ্টন করিল।

হরেশচন্দ্র সপ্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "ভাই! ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে এ মধুর বেশ চিরপূজ্য। আমি অজ্ঞ—এ অপূর্ব্ব ত্যাগ-পূর্ণ যোগী বেশ ধারণ করিয়া লোকের কাছে এত সমাদৃত, জানি না, সেই দিব্য জ্ঞানময় পরম যোগী দেবদেব শঙ্কর, যথার্থই সম্মানের কি উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। এস, যোগীশ্বরের ধ্যান শিখ্‌বে এস।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহে ব্যাপন্ন

আজ যোগমায়ার বিবাহ। সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে বাদ্য-বাজনার বড় ধূম পড়িয়াছে; পাচক-পাচিকা দাসদাসী মুটেমজুরের কোলাহলে বাড়ী জাঁকাইয়া উঠিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য পাড়ায় লোকের নিকটে এক চাল চালিয়াছেন, দেশ-বিদেশ হইতে অর্থের দাস পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ আনাইয়া এ বিধবা বিবাহ দিতেছেন। কুলপুরোহিত তাঁহার উপর ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পৌরহিত্যকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, কুলনাপিত পাড়ার লোকের পরামর্শে আজ তাঁহার দ্বারস্থ হয় নাই; সুরেন্দ্রনাথ এ সকলে বিচলিত না হইয়া নিজের মর্য্যাদা ও অর্থ গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, নাপিত আনাইয়াছেন। অনেক দরিদ্র বিদেশী লোভী ব্রাহ্মণগণকে ছাতা, কলসী ও অর্থ বিতরণ করিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছেন; তাঁহারা সে সকল পাইয়া পথিমধ্যে যাইতে যাইতে সুরেন্দ্রের খুব প্রশংসা করিতেছিল। খুব রোসনাই করিয়া বর আসিবার জন্য, সুরেন্দ্রনাথ ভগবতীচরণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃপণ-স্বভাব ভগবতী বেশী অর্থ ব্যয় না করিয়া সামান্যরূপ বাদ্য-বাজনা করিয়া বর লইয়া আসিলেন।

বর আসিলে সুরেন্দ্রনাথ যথাবিধি বরকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু হেমলতা বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। তাহার গৃহে আজ কুলমহিলা-দিগের সমাগম নাই, বরকে কে বরণ করিবে—এই ভাবনায় আকুল

হইয়া উঠিল। অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া হেমলতাকেই ঐ সকল শুভ কার্য্য সমাপন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। হায়! একদিন যে হেমলতার বাড়ীতে শত শত পুরমহিলার নিত্য একত্র সমাবেশ হইত, যাহার আলয়ে আদর্শ সতী মহামায়ার অবস্থিতিকালে পাড়াপ্রতিবেশিনিগণ একবার না আসিয়া জল গ্রহণ করিত না। আজ তথায় বিবাহে স্ত্রী-আচার কার্য্য করিতে কেহই আসে নাই। সমাজের কঠোর শাসন-বলে সুরেন্দ্রনাথ এ স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন।

কোনও প্রকারে সুরেন্দ্রনাথ যোগমায়া ও শিবনাথের সহিত চারি চক্ষে মিলন করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। শিবনাথ যোগমায়ার চক্ষের প্রতি চাহিলে, যোগমায়া তাহার প্রতি চাহিয়াছিল কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না; তখন সুনীলগগণে কোটী কোটী নক্ষত্র পুঞ্জ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—আর তাহার মধ্যস্থলে এক জ্যোতির্ম্ময় শশধর বিরাজিত ছিল। যোগমায়া কাতর প্রাণে সেই নীলিমাময় গগণস্থিত চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া একবার পূর্ব্ব স্বামীর কথা স্মরণ করিল। ক্ষীণ নক্ষত্রালোকের ন্যায় শিবনাথের চক্ষু রশ্মি তাহার কাছে বিফল হইয়াছিল। আমরা বিবাহের পর শুনিয়াছি—যোগমায়া শিবনাথের প্রতি সেই বিবাহের শুভ মুহূর্ত্তে একবারও দৃষ্টিপাত করে নাই।

বিবাহ কার্য্যের পর পানভোজনের আনন্দস্রোত বহিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই আসেন নাই; তাঁহার অফিসের সাহেব প্রভৃতি এ আনন্দে যোগ দিয়াছিলেন, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ সাহেবদিগের শুভাগমনে প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে চব্যচোষ্যলেহ্য-

পেয় আহার্য্যদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিবার পর, নূতন কুটুম্ব ভগবতী-চরণকে বিশেষ সমাদরসহকারে কহিলেন, "আমি আপনার যথোচিত অভ্যর্থনা করতে পেরেছি কিনা, বল্‌তে পারি না; যদি কোন ত্রুটি হ'য়ে থাকে, নিজ গুণে মার্জ্জনা কর্‌বেন।"

ভগবতীচরণ কহিলেন, "আজ্ঞা, আমি আপনার ঘরের লোক, আমার জন্য কিছু কিন্তু বোধ কর্‌বেন না; তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বিবাহের পর ছেলেটার জ্বর এসেছে। সহসা এমন হ'ল কেন বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিলেন, "তাই ত এমন কেন হইল? নিশ্চয় এ কোন অশুভ লক্ষণ।" অতঃপর ভগবতীকে কহিলেন, "এখন কেমন দেখ্‌লেন।"

ভগবতী কহিলেন, "জ্বরে ধুঁক্‌ছে।"

এমন সময়ে কান্তিচরণ আসিয়া কহিল, "না—না—ভাব্‌বেন না, অনেকটা সুস্থ আছে—এখন ঘুমিয়েছে।" মনে মনে ভাবিল, "একেই বলে প্রেম জ্বর—আফিমের নেশা করা অভ্যাস, কম পড়েছিল—তাই নেশার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিল, আফিম এনে দি—তবে বাঁচে; জবর পাত্র বটে।"

ইহা শুনিয়া ভগবতীচরণ কহিল, "তবে আমি এখন আসি, কাল বৈকালে বর যাবার ব্যবস্থা রহিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাল থাক্‌লেই হয়।"

কান্তি। খুব থাক্‌বে, আপনি চিন্তা কর্‌বেন না।

"তাই হোক" বলিয়া ভগবতীচরণ প্রস্থান করিল।

অতঃপর কান্তিচরণ সুরেন্দ্রনাথের তোষামোদ করিয়া কহিল, "বাবু! যা কাজ হ'ল, এমন বড় একটা কোথায়ও দেখা যায় না।" সব

লোক খুশী হয়েছে, বামুনগুলোকে এক-একটা কলসী দেওয়ায় তারা আপনাকে দু' হাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'রে গিয়েছে, আপনার ভাল হ'বে।”

সুরেন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে কহিলেন,“আমি তাদের ফটো তুলে রেখেছি, এর পর ঐ বামুনগুলোই বল্‌বে যে, সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিনি, সেটা হচ্ছে না।”

কান্তি। বেশ করেছেন, বেশ করেছেন, আর যায় কোথায় ?

সুরেন্দ্র। আচ্ছা, হরলাল কোথায় গেল বল দেখি ; সে এ সময়ে আসেনি কেন ?

কান্তি। বোধ হয় জ্বর হ'য়ে থাক্‌বে, লোকের বিপদ-আপদের কথা বলা যায় না ; তা বাবু! আমি এখন আসি তবে।

সুরেন্দ্র কহিল, “খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত ?”

কান্তি। খুব খুব।

সুরেন্দ্র। ছেলেদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে যাবে না ?

কান্তি। আজ্ঞা, আমার আর ছেলে-পিলে কোথায় ? আপনার অনুগ্রহে আমাদের দু'জনের কষ্টে-স্বষ্টে দিন কেটে যায়।” তা যদি দেন, আমার “তাঁকে” কিছু খাবার দিতে পারেন।

“বেশ, বেশ, নিয়ে যাও না।” এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ কান্তিচরণের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভগবতীর ভরসা দান

বিবাহের পর দিবস প্রাতঃকালেই শিবনাথের জননী বসন্তকুমারী সুরেন্দ্রনাথের বাড়ী ছেলের অবস্থা জানিবার জন্য ঝী পাঠাইয়াছিল। সে গিয়া দেখিল যে, শিবনাথের বেশ জ্বর ফুটিয়াছে; মাথার পীড়ায় সে অস্থির হইয়াছে। ঝী যাহা দেখিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা যন্ত্রণার অনেক কথা বাড়াইয়া বসন্তকুমারীকে আসিয়া বলিল। শুনিয়া বসন্তকুমারী ভগবতীচরণের নিকট ব্যস্তভাবে হাঁফাইতে হাঁফাইতে গিয়া উপস্থিত হইল।

ভগবতীচরণ একে নেশাখোর, তাহার উপর পূর্ব্ব রাত্রে অধিক জাগরণের দরুণ সে আজ অধিক বেলা হইলেও অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। বসন্তকুমারীর পুনঃ পুনঃ ডাকে তিনি শয্যায় শুইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে দিদি, এত চাৎকার কেন?"

বসন্তকুমারী কহিল, "ও ভাই, শিবুর ব্যারাম বেড়েছে, তুমি একবার সেখানে গিয়ে দেখে এস।"

ভগবতীচরণ শয়নাবস্থায় থাকিয়াই কহিলেন, "তাই ভাল, আমি মনে করেছিলেম যে চোরে বুঝি সিঁদ কেঁটেছে।"

বসন্তকুমারী কহিল, "বালাই তা কেন? তুমি শীগ্‌গীর মুখ হাতে ধুয়ে সেখানে যাও।"

ভগবতীচরণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া কহিল, "দিদি, তুমি মিছে ভেবো না, সেটা বেজায় আফিম খোর, কাল রাত্রে যদি তার রকম-সকম দেখ্‌তে, তা হ'লে না জানি তুমি কিছু-না-কিছু একটা ক'রে বস্‌তে আর কি? আমি তার স্বভাব জানি—তাড়াতাড়ি সেই ঘটককে আফিম খানিকটা দি, সে গিয়ে তাকে খাওয়ায়, তবে তার হাই ওঠা থামে।"

তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তথায় বিরজাসুন্দরী আসিয়া কহিল, "নাগো ঠাকুর-ঝী. শিবুর খুবই জ্বর হয়েছে, ঝাঁ দিছে কথা বলেনি।"

বিরজা ভগবতীচরণের স্ত্রী।

ভগবতীচরণ কহিল, "থাম থাম, তোমার আর বক্তৃতায় কাজ নাই। দিদি! তোমরা যাও, আমি যাচ্ছি।"

বসন্তকুমারী কহিল, "কি জানি বৌ! আমার অদৃষ্টে কি আছে, আমি এ বিধবা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হইনি। ভগবতীই এ কাজটা কর্‌লে?"

ভগবতী। বটে, বলি পাঁচ হাজার টাকা কি অমনি পেয়েছ?

"আমার ছেলে ভাল থাক্‌লে অমন কত টাকা হ'বে, এখন সেখানে তুমি যাও ভাই!" এই বলিয়া বসন্তকুমারী প্রস্থান করিল।

ভগবতী মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "হ'বে? যা আছে, সে সবও উড়িয়ে দিত, ভাগ্যে আমি এত টাকা টাকা করি তাই আছে। নৈলে সব শূন্য দিদি! এতদিন সব শূন্য হ'ত।"

বিরজা কহিল, "কি টাকাই চিনেছ, ঐ জন্যই ত ঘরে আমার ছেলে হ'ল না।"

ভগবতীচরণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এক রকমে বেশ বেঁচেছি। ভাগ্যে টাকা ছিল, তাই ছেলে হয়নি, তা না হ'লে তোমার বছরে দু' দু' ছেলে হ'ত।"

বিরজা হাসিয়া কহিল, "তা ত আর হ'ল না. মনে আক্ষেপই রয়ে গেল।"

"আর আক্ষেপে কাজ নাই—টাকা থাকলে পাঁচটি [illegible] তোর সাত বেটার কাজ হ'বে।" এই বলিয়া [illegible] গেলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুখবর

বাস বিবাহের দিন বর আনা হইল না। সুরেন্দ্রনাথ জ্বর গায়ে পাত্র পাঠাইতে আপত্তি করায় ভগবতীচরণ আর কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই; পর দিবস শিবনাথ একটু সুস্থ হইলে তিনি বর-কনে লইয়া গেলেন, কোনরূপ বাদ্য-বাজনার আর আয়োজন করেন নাই।

এই প্রসঙ্গ লইয়া পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে নানারূপ জনরব রটিতে লাগিল। কেহ কহিল, সুরেন্দ্রনাথ যেমন জেদে প'ড়ে বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়েছে, তেমনি জব্দ হয়েছে। বিয়ের রাত্রেই বরের জ্বরবিকার হয়েছে।" কেহ কহিল, "না—না—তার কলেরা হয়েছিল।" কেহ কহিল, "শিবনাথ মরণাপন্ন।" কেহ কহিল, "মরিয়াছে।"

এইরূপে নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল।

মহামায়া এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। ভাবিল, "হায় ছোট দাদা! তুমি জেদের বশে একটা অবলা সরলার কি সর্ব্বনাশই করলে! সে আমাকে ভিন্ন জান্[illegible] না [illegible] তাকে নিজের কন্যার অপেক্ষাও স্নেহ করতেম। [illegible] দুঃ[illegible] কি আছে।"

মহামায়া যখন গৃহমধ্যে [illegible] ভাবিতেছিল। এমন সময়ে তথায় ক্ষেমঙ্করী আসিয়া [illegible]ল, "[illegible]মায়া! ছোট ঠাকুরপোর নূতন জামাইএর নাকি বড় অসুখ?"

মহামায়া কহিল, "এই রকম ত শুনছ বৌ-দিদি! ওরা নিজের দোষে নিজেই কষ্ট পাচ্ছে। তোমাদের কষ্ট দিয়ে ওরা দু' ভায়ে পরামর্শ ক'রে বিষয় ভাগ করেছিল, তুমি নিজের বসত্বাটী সামান্য মূল্যে বিক্রয় ক'রে এই ভাঙ্গা বাড়ী ভাড়া করে রয়েছ, ভগবান এর বিচার কর্‌বেন। তুমি ক্ষমা করেছ, কিন্তু তাঁর বিচার সূক্ষ্ম। আমি অভিভাবক জেনে, মেজ দাদার কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রাখ্‌লুম, তাও সে ফাঁকি দিয়ে আত্মসাৎ করেছে। ধর্ম্মে সইবে কেন? এক ভাই ছেলে নিয়ে ভুগে মর্‌ছে, অপরটী মেয়ের জ্বালায় অস্থির। আমি এতে সুখী নই—কেবল ভাবি, মানুষে দু'দিনের জন্য এই সংসারক্ষেত্রে এসে, কেন একজন অপরের মনে কষ্ট দেয়। কেন না, মানুষ ধর্ম্মের দিকে চেয়ে কাজ করে।"

ক্ষেমঙ্করা কহিল, "তুমি আর ও সব কথা ভেবো না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল, হয়েছে। ওদের দোষ কি? আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার ননী, নৃত্য ও প্রিয়গোপাল ভাল থাকে। তা হ'লেই আমি সুখী; আহা বাছারা আমার কত কষ্টই না সহ্য কর্‌ছে।"

মহামায়া কহিল, "কষ্ট, ভগবান একদিন-না-একদিন মুখ তুলে চাইবেন। ছেলেরা তোমার মানুষ হয়েছে, তারা বাপের নাম বজায় রাখ্‌বে।"

এই সময়ে ননীগোপাল আসিয়া সহাস্যে কহিল, "মা, আজ বড় সুখবর, আমি ওকালতী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি।"

ক্ষেমঙ্করী শুনিয়া কহিল, "শুনে বড় সুখী হলুম, আশীর্ব্বাদ করি—তোমরা সহস্রপোষী হও বাবা!"

মহামায়া কহিল, "তোমরা বাপের নাম রক্ষা কর।"

ননী। নৃত্যও ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হয়েছে। প্রিয়কে এইবার

শিবপুর কলেজে ভর্ত্তি করেছি, সে বড়ই মেধাবী, এবার ইঞ্জিনিয়ারিং এ পাশ কর্‌তে পার্‌লে আমাদের আশা পূর্ণ হয়।

মহামায়া। ঈশ্বর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন, তোমরা ধর্ম্মের মুখ চেয়ে কাজ করছ, তিনিই তোমাদের সহায় হবেন।

ননী। পিসী-মা! অনুপমা একখানি আমায় পত্র লিখেছে যে, তার স্বামী তাকে একেবারে দূর-ছাই কর্‌ছে—মদ আর বেশ্যা নিয়েই উন্মত্ত।

মহামায়া। জানি, সে আমায়ও লিখেছে। কি কর্‌বে বল, সবই অদৃষ্ট।

ননী। দেখি, যদি আমি একবার হরেনের সঙ্গে দেখা ক'রে, তার মনের ভাব ফিরাতে পারি।

"দেখ, চেষ্টায় হ'তে পারে না, এমন কার্য্য নাই।" এই বলিয়া মহামায়া ক্ষেমঙ্করীর হাত ধরিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "বৌ-দিদি! এইবার ননীর বিয়ের সব ঠিক কর।"

ক্ষেমঙ্করী কহিল, "সে সব ভাই তুমিই কর, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, ও সব ভার তোমাকেই দিলুম।"

"বেশ! তাতে আমি পেছপা নই।" এই বলিয়া মহামায়া ক্ষেমঙ্করীকে লইয়া অন্যত্র গেল।

ননীগোপাল ভাবিল, "বিবাহ! পিসী-মা আসিয়া অবধি আমার বিবাহের কথা লইয়া বড় বেশী আন্দোলন করিতেছে, আমি যুবক—বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য পিসী-মার এত আগ্রহ কেন? মাকে বুঝিয়েছিলুম যে, বি এল পাশ না করা অবধি বিবাহ কর্‌ব না, এখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, এবার পিসী-মার হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই? হায়! বিবাহের কথা উঠ্‌লেই আমার সাতকড়ি দাদাকে মনে পড়ে। পিসী-মা

একদিন বড় আনন্দ ক'রে তাঁর বিবাহ দিয়েছিল, কিন্তু সব বৃথা; সাতকড়ি দাদা কোথায় নিরুদ্দেশ হ'ল, বৌ-দিদি সৎশাশুড়ীর গঞ্জনা সহে দিন কাটাচ্ছে। আর অনুপমা! তাঁহার দুঃখের সীমা নাই; জানি না, কোন্ কুহকমায়ায় আবদ্ধ হইয়া হরেন্দ্রনাথ তাহাকে এত অযত্ন করে। বাঙ্গালায় ব্যভিচার স্রোত দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে প্রবাহমান্। উচ্ছৃঙ্খল যুবকবৃন্দ পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয় ভুলিয়া, বিষময় বারাঙ্গনাপ্রেমে মুগ্ধ; পরদারগামী বেশ্যার অনুগত ঐশ্বর্য্যবান্ যুবক সমাজে অনাদৃত নহে। হায় হিন্দুসমাজ! তোমার সে অমিত তেজঃ কি এতই বিমলিন হইয়াছে যে, এ সকল দমন করিতে তুমি অসমর্থ! ধন্য কাল, তোমার লীলা বিচিত্র!"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রামশরণের অধঃপতন

রামশরণ, কীর্ত্তিবাস ও শ্যামাঙ্গিনীর সেবা ও যত্নে বেশ সুস্থতালাভ করিয়াছে, কিন্তু শ্যামাঙ্গিনীর সুকোমল করস্পর্শে তাহার প্রাণের কামনা আরও [illegible]ন্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক ও শ্যামাঙ্গিনী কেহই রামশরণের অধঃপতনের বিষয় জানিতে পারে নাই ; রামশরণ পূর্ব্বের ন্যায় আর রোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষায় মন দিত না, নিজের শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে নীরবে বসিয়া শ্যামাঙ্গিনীর বিষয় ভাবিত। আজ সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে, তখনও আকাশে চন্দ্রোদয় হয় নাই, চারি-দিকে ঘন কাদম্বিনীশ্রেণী স্তরে স্তরে সঞ্জাত হইতেছে, ঘন ঘন অশনি গর্জ্জিতেছে, সামান্য জল পড়িতেছে, এমন সময়ে রামশরণ সেই বন-মধ্যস্থ এক পর্ণকুটীরে বসিয়া ভাবিতেছিল, "শ্যামাঙ্গিনী আমায় নিশ্চয়ই ভালবাসে, নতুবা সে আমার মুখে সেদিন সযত্নে জল সেচন করিয়া আমার চৈতন্য সম্পাদন করিবে কেন ? মরি মরি কি সুকোমল বাহু, ইচ্ছা হয়—আমি আজীবন সেইরূপে শয়ন করিয়া থাকি, আর আমার পার্শ্বে বসিয়া শ্যামাঙ্গিনী সেইরূপ স্থির ধীরভাবে নির্ণিমেষনেত্রে চাহিয়া আমার সেবা করুক। সেদিন গুরুদেব না থাকিলে আমি তাহাকে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। দেখিতেছি, গুরুদেবই আমার এ উদ্দেশ্যসাধন পথের নিদারুণ অন্তরায়, তিনি থাক্‌তে আমার আশা পূর্ণ হইবে না। শ্যামাঙ্গিনী কি গুরুদেবের প্রতি আসক্তা ? গুরুদেবই বা তাকে কোথা হইতে এ স্থানে লইয়া আসিলেন ? শুনিয়াছি, সে

কুলত্যাগিনী—আমি আজ তাহাকে আমার বাসনা জানাইব। গুরু-দেব নাই, উত্তম সুযোগ—দেখি সে এখন কোথায়!"

এই ভাবিয়া সে রোগীদিগের কুটীরে শ্যামাঙ্গিনীর অনুসন্ধান করিতে গেল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঘোর কাদম্বিনী বক্ষে সৌদামিনী যেন রামশরণের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য এক-একবার আপন দীপ্তি প্রকাশ করিতেছিল, আর বজ্র ভীমরবে হাঁকিয়া যেন শ্যামাঙ্গিনীকে সাবধান করিয়া দিতেছিল।

রামশরণ আশা প্রমোদিত হৃদয়ে শ্যামাঙ্গিনীকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে, সে সেই কালী প্রতিমার সমক্ষে একাকিনী নিদ্রা যাইতেছে, মায়ের সন্নিকটে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আর তাঁহার ত্রিনেত্র হইতে যেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইয়া শ্যামাঙ্গিনীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অনুপম সৌন্দর্য্য-সম্পদে বিভূষিতা করিয়াছে। রামশরণ পলকশূন্যনেত্রে শ্যামাঙ্গিনীকে দেখিয়া কহিল, "যা থাকে অদৃষ্টে, আজ আমার শেষ চেষ্টা, হয় শ্যামাঙ্গিনী আমার হইবে, নয় চিরদিনের জন্য আমি কলঙ্কের পসরা বহন করিব।" এই ভাবিয়া সে নিদ্রিতা শ্যামাঙ্গিনীর পার্শ্বে গিয়া বসিল। ঠিক এই সময়ে রামশরণের মস্তকের উপর দিয়া একটা অশনি ভীমবেগে গর্জ্জিয়া গেল, সে ভীম বজ্ররবে দেবী প্রতিমা কাঁপিয়া উঠিল, বনভূমি কম্পিত হইল, নিদ্রিতা শ্যামাঙ্গিনী জাগিয়া বসিল; কিন্তু রামশরণের হৃদয় টলিল না, সে আজ রূপ-মুগ্ধ, জ্ঞান-বিবর্জ্জিত, মৃত্যুকে বুকে টানিয়া লইতেও কুণ্ঠিত নহে।

শ্যামাঙ্গিনী এই বিভীষিকাময়ী রজনীতে রামশরণকে পার্শ্বে দেখিয়া চকিতভাবে কহিল, "একি, তুমি আজ এখানে কেন?"

রামশরণ মৃদুহাস্যে কহিল, "কেন, আসিতে নাই কি?"

সে হাসি দেখিয়া শ্যামাঙ্গিনীর হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল, সে ঘৃণা, রোষ ও বিরক্তির সহিত কহিল, "না, যাও—দূরে যাও। রামশরণ! তুমি কি গুরুর উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছ? তিনি বলেন, মাতা উপযুক্ত পুত্রেরও অতি সন্নিকটে থাকিবে না। এ ভীষণ দুর্য্যোগময়ী রজনীতে তোমার এত আনন্দ হর্ষোৎফুল্ল হাসি কেন?"

রামশরণ আকুলতাপূর্ণস্বরে কহিল, "তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া তোমার দাস হইতে আসিয়াছি! শ্যামাঙ্গিনি! আজ তুমি আমার হও। তোমার ও অতুল্য রূপরাশি, ও ইন্দিবর সমতুল্য বিশাললোচনের ভ্রূভঙ্গিমা, আমায় উন্মাদ করিয়াছে, তোমার পায়ে পড়ি; একদিনের জন্য তুমি আমার হও।"

শ্যামাঙ্গিনী সহসা রামশরণের মুখে এই ঘৃণিত প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিতা হইল। সদর্পে তাহাকে পদাঘাত করিয়া কহিল, "দূর হ, নরপশু! আমায় না তুই গুরুদেবের সমক্ষে ভগ্নী বলিয়া সম্ভাষণ করিস্?"

রামশরণ আহত স্থানে হাত বুলাইয়া কহিল, "সেটা মৌখীক সুন্দরি! অন্তরে অন্তরে আমি এখন তোমায় পত্নীত্বে বরণ করিয়াছি। দেখ, বিরূপা হয়ো না, বুঝিয়াছি—তুমি গুরুদেবের প্রণয়িণী, তা হও। মাত্র একদিনের জন্য আমার বাসনা পূরাও, তার পর তুমি যার, তারই থেকো।"

শ্যামাঙ্গিনী আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিল, "পিশাচ! তোর ও পাপ কথা উচ্চারণ করিয়া আর এ দেবী স্থান কলঙ্কিত করিস্ না, দূর হ'—এ স্থান হইতে।" এই বলিয়া সে তথা হইতে কালীর প্রতিমার সন্নিকটবর্ত্তিনী হইল।

রামশরণ বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া কহিল, "যেও না শ্যামাঙ্গিনী, আমি বহুদিন হইতে তোমায়

আমার অভিলাষ জানাইব মনে করিতেছি ; আজ এ উত্তম সুযোগ, হয় আমার ইচ্ছা পূরণ কর, নয় তোমার নিস্তার নাই। আমি মরিতে বসিয়াছি,কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার সুখের পথে কাঁটা দিব, গুরুহত্যায়ও আমি পশ্চাৎপদ হইব না ; তোমায় চাই—তুমি আমার হও।”

“এ জীবন থাকৃতে নয়।” এই বলিয়া শ্যামাঙ্গিনী কালীর হস্ত হইতে খড়্গা লইয়া কহিল, “সাবধান! নরপিশাচ! আর এক পা অগ্রসর হলেই আমি তোর শিরশ্ছেদ কর্‌ব।”

রামশরণ এক লম্ফে শ্যামাঙ্গিনীকে আক্রমণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে খড়্গা কাড়িয়া লইতে শ্যামাঙ্গিনীর বাম হস্তে আঘাত লাগিল। তাহা দেখিয়া রামশরণ কহিল, “সুন্দরি! এখনও বল্‌ছি, তুমি একদিনের জন্য আমার হও; বৃথা চেষ্টা, আমি তোমায় আজ সহজে ছাড়িব না।”

শ্যামাঙ্গিনী দারুণ আঘাতে ভূতলশায়িনী হইল। সে কাতর প্রাণে কহিল, “মা কপালিনি! একি করলি মা? এ নির্জ্জন বনভূমে তোর সমক্ষে এক নিষ্ঠুর কপটাচারী নরপিশাচ আমার উপর অত্যাচার কর্‌বে? আর তুই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বি। গুরুদেব! গুরুদেব! রক্ষা করুন, আপনি ভিন্ন আমার আর কেউ নাই।”

“তুমি আমার হও, আমি তোমায় প্রাণ দিয়া ভালবাসি।” এই বলিয়া যেমন রামশরণ শ্যামাঙ্গিনীকে ধরিতে যাইবে, এমন সময়ে তাহার পশ্চাদ্দিক্ হইতে সেই হীন পরিচ্ছদধারী ফিরিঙ্গী আসিয়া সহসা রামশরণের হস্তের খড়্গা কাড়িয়া লইল, এবং বাম হস্তে একটি রিভলভার রামশরণের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, “Stop you brute! or else I shall murder you. রে পশু! নিরস্ত হ’, নতুবা আমি তোকে হত্যা করিব।”

রামশরণ সহসা সেই ফিরিঙ্গীকে সেই ভাবে দেখিয়া বিস্ময়াপন্নচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমে পতিত হইল। তাহার পতনে সেই স্থানের স্তিমিত প্রদীপ নিবিয়া গেল।

ফিরিঙ্গী শ্যামাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "You are saved lady! মা! তোমার ভয় নাই।"

অতঃপর গুপ্ত পকেট হইতে আলো বাহির করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে রামশরণ তথা হইতে সহসা পলায়ন করিল; তাহা দেখিয়া ফিরিঙ্গী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল, কিন্তু তাহার সন্ধান ব্যর্থ হইল; সে গুলির আওয়াজে অসংখ্য শিবাদল চীৎকার করিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গী দ্রুতপদে রামশরণের অনুসরণ করিল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কীর্ত্তিবাস

রজনীর দ্বিযাম অতিক্রম করিয়াছে। আকাশে আর সে মেঘ নাই, অশনির বিকট গর্জ্জন ও বারিবর্ষণ থামিয়াছে ; নিশানাথের স্নিগ্ধ উজ্জ্বলকর ধরিত্রীবক্ষে শোভা পাইতেছে, এমন সময়ে যুবক ধীরে ধীরে আপন আবাসে ফিরিয়া আসিল। প্রত্যহ যেরূপভাবে আসে, আজও সেইরূপে আসিল, কিন্তু বনভূমিতে প্রবেশ করিবার সময় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আতুর অন্ধ রোগিগণ বন্দুকের আওয়াজে ও রাম-শরণের পলায়নে ভীত হইয়া নবাগত সাহেবের বিষয় লইয়া পরস্পরে আন্দোলন করিতেছে, এমন সময়ে যুবক তথায় উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিয়া কুষ্ঠ রোগী কহিল, "কে, বাবা এসেছেন ! বড় বিপদ্ বাবা, বড় বিপদ্ !"

"কি বিপদ্ ?"

"আমরা সকলে ঘুমুচ্ছি—তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, এমন সময়ে এই বনের ভিতর বড় গোলমাল হ'ল ; আমি একটু উঁকি মেরে দেখ্লুম, রাম দাদা দৌড়ে পালাচ্ছে, আর একটা সাহেব তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়্লে—তার পর রাম দাদার পেছু পেছু ছুটে গেল।" এই বলিয়া সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি হাঁফাইতে লাগিল।

শুনিয়া যুবক কহিল, "মা কোথায় ? তার কোন বিপদ্ হয় নি ?"

"কি জানি বাবা, তারও ত সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না।"

যুবক কহিল, "সে কি ? এত যখন গোলমাল হ'ল, তখন মা'র শব্দ পাওনি ?"

"না—মাকে ত দেখিনি, সন্ধ্যার পর আমাদের খাবার দিয়েছিল।"

"দেখি—যদি সে ভবানীর কুটীরে থাকে।" এই বলিয়া যুবক আলো হস্তে লইয়া সেই কালীর কুটীর সমীপে গিয়া দেখিল যে, শ্যামাঙ্গিনী তথায় অচৈতন্যভাবে তখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার বাম হস্তে খড়্গের আঘাতে দরদর ধারে রুধির বহিতেছে। যুবক তাহার এ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল; ভাবিল, "কি দুর্দ্দৈব! মা নৃমুণ্ড-মালিনি! একি করলি মা! আমি যে বড় আশায় এ অভাগিনীকে তোর পূজায় নিরতা করেছিলুম; জানি না, কি অপরাধে তুই এর উপর বিরূপা হলি। সেই একদিন এইরূপে এ অনাশ্রিতা অবলাকে আমি একাকিনী পথিমধ্যে পতিতা দেখেছিলুম, আজ আবার আমার এ আশ্রমে সেইরূপ অবস্থায় দেখ্‌ছি; জগদম্বে! জানি না মা, তোর অভি-প্রায় কি? যাই হোক্, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করি কেন?" এই ভাবিয়া সে শ্যামাঙ্গিনীকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

শ্যামাঙ্গিনী তাহার শুশ্রূষায় চৈতন্য পাইয়া কহিল, "কে, বাবা এসেছেন, পালান; এ স্থান হ'তে পালান—ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা, আমি মরি ক্ষতি নাই, আপনি পালান!"

যুবক কহিল, "কেন মা, ভয় কি? এ দুনিয়ায় আমি ত কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই, ভয় কাহাকে বলে তা ত আমি জানি না—দীন দরিদ্র আমি, আজ তুমি আমায় এ কি বিভীষিকা দেখাচ্ছ মা?"

শ্যামাঙ্গিনী উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তাহা পারিল না—আবার শুইয়া পড়িল, তখনও তাহার সর্ব্বাবয়ব কাঁপিতেছিল। সে কহিল, "বাবা, আমার কথা শুনুন! আপনি পালান, ঐ কৃতঘ্ন রামশরণ আপনাকে হত্যা করতে আস্‌ছে।"

যুবক সবিস্ময়ে কহিল, "একি! প্রলাপ?"

শ্যামাঙ্গিনী শয়নাবস্থায় থাকিয়া কহিল, "না—না—প্রলাপ নয়, মা কালী যেন আমায় বল্‌ছেন যে, পাপিষ্ঠ রামশরণ আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌তে আস্‌ছে—আপনি পালান।"

যুবক সবিস্ময়ে কহিল, "রামশরণ কৃতঘ্ন?"

শ্যামাঙ্গিনী কহিল, "হাঁ বাবা, সে অবিশ্বাসী, কপটাচারী, আজ আমার উপর কুব্যবহার করেছে। পশু বলে সে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছিল, আমি বাধা দেওয়ায় সে আমার এ অবস্থা করেছে; বলেছিল যে, তার পশুবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌তে যদি গুরুহত্যা কর্‌তে হয়, তাতেও সে পশ্চাদপদ হবে না। সে নারকী—আমার উপর বলপ্রয়োগ কর্‌তে এসেছিল, দৈবাৎ এক সাহেব এসে আমায় রক্ষা করেছেন, তার পর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম; জানি না, রামশরণ কোথায় পালিয়েছে—আর সে সাহেবই বা কোথায় গেলেন।"

ইহা শুনিয়া যুবক সবিস্ময়ে কহিল, "কে সে সাহেব? এ বনভূমিতে তবে কি কোনও গুপ্তচরের যাতায়াত হইয়াছে। যাই হোক্, মন! স্থির হও, হৃদয় প্রশান্তভাব ধারণ কর; যে সাহেব বিপদগ্রস্তা একাকিনী রমণীকে সাহায্যদানে তাহার মান রক্ষা করেছেন—তিনি অবশ্যই সম্মানার্হ। আর রামশরণ কি এতই নীচ! একদিন আমি পথ হ'তে মৃতকল্প অবস্থায় এ স্থানে আনিয়া তাহাকে নিরাময় করি, বসন্ত রোগে তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হয়েছিল, তাহার ফলে এক চক্ষুহীন হইয়া পড়ে। সে আমার সহায়তায় যে জীবন পণ করিয়াছিল, এ বনভূমিতে আমাদের আবাস, আমি আর সে ভিন্ন অপরে কেহ জানে না, বন্যপশুগণের বিকট চীৎকারে কেহই এ স্থলে আসিতে সাহসী হয় না, তবে কোথা হইতে সে সাহেবের আবির্ভাব হইল।"

যুবক ও শ্যামাঙ্গিনীতে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে তথায় গুড়ুম গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল, সে আওয়াজে সারমেয় ও শিবাদল বিকট নিনাদে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। অতঃপর বহু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিস প্রহরী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে একজন জমাদার কহিল, "হাঁ, ঠিক বাত ; আসামী হাজির হ্যায়—পাকৃড়ো।"

প্রহরিগণ কহিল, "পাকৃড়ো—পাকৃড়ো।"

যুবক নির্ভীকচিত্তে কহিল, "অপরাধ ?"

জমাদার সগর্ব্বে কহিল, "তোম এই জেনানা কো কাহাসে চুরি করকে লেয়াকে বেইজ্জত কিয়া, খুন কর্‌নে মাংতা থা।"

যুবক স্মিতহাস্যে কহিল, "কে তোমাদের এ কথা বলেছে ? এ আমার মা, মাকে কি সন্তান কখনও খুন কর্‌তে পারে ?"

"তোম্ শালা লোক সব কর্‌নে সেকৃতা—বদমাস, শালা, এ জঙ্গলমে তোম্ বহুত রোজ হ্যায়, হাম লোক সব খবর মিলতা, আবি চলো থানামে চলো।" এই বলিয়া জমাদার তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল।

এমন সময়ে তথায় একজন কনেষ্টবল আসিয়া কহিল; "জমাদার সাব! সে কানা শালা ভাগ গিয়া—উস্‌কো মিলতা নেহি।"

জমাদার বিস্ময়ান্বিতচিত্তে বলিল, "কেয়া তাজ্জবকা বাত! ও শালা ভাগ গিয়া ? দেও, আবি থানামে খবর দেও, আসামী পাকাড় গিয়া—আর সে খবর দেনাওয়ালা ভাগা হ্যায়।"

যুবক সাগ্রহে কহিল, "কে তোমায় এ খবর দিয়েছে, জমাদার সাহেব! শোন—আমি নিরপরাধী, অত্যাচার করো না।"

জমাদার গোঁফে তা দিতে দিতে কহিল, "চোপরাও শালা, চালাকি

ছোড়—ঝুটা বাত মৎ বোলো, তোমারা আদমী রামশরণসে হাম লোক সব খবর মিলা হ্যায়, তোম শালা ডাকু হ্যায়—খুনী হ্যায়।

ইহা শুনিয়া শ্যামাঙ্গিনী অতি কষ্টে উপবেশন করিয়া সভয়ে কহিল, "শিবানি! এ কি বিপদে ফেল্‌লি মা! আমার জন্য গুরুদেব আজ মহা বিপদ্‌গ্রস্ত, তারা—রক্ষা কর মা।"

অতঃপর সে জমাদারকে কহিল, "দোহাই জমাদার সাহেব, ইনি সাধু পুরুষ, কোন দোষের দোষী নন।"

জমাদার কহিল, "তোম মৎ ডরো মা! হামারা লোক কো সাৎ চলো—তোম্‌কো হাসপাতালমে ভেজেগা।"

এমন সময়ে তথায় একজন পুলিসের ইংরাজ কর্ম্মচারী আসিয়া যুবককে কহিলেন, "Oh! You culprit! তোমার দুরভিসন্ধি আমরা অবগত হইয়াছি, তুমি তোমার অনুগত রামশরণকে দূর করিয়া দিয়া এই অবলা রমণীকে নির্যাতন করিতেছ! ইনি হিন্দু-মহিলা—ইহাকে হত্যা করিবার উদ্যোগে তুমি অপরাধী।"

শ্যামাঙ্গিনী নির্ভীকচিত্তে কহিল, "না সাহেব, ইনি আমার পিতা, ইনি আমার উপর কোন অত্যাচার করেননি, সেই রামশরণ আমায় হত্যা কর্‌তে এসেছিল।"

পুলিসের সাহেব এই কথা শুনিয়া কহিল, "কি? রামশরণ তোমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল।"

শ্যামাঙ্গিনী। এসেছিল কেন সাহেব, এই দেখ—আমায় কি নিদারুণভাবে আঘাত করেছে; সে পিশাচ—দস্যু—নারকী।"

সাহেব কহিল, "জমাদার! রামশরণকো লে আও।"

একজন প্রহরী কহিল, "হুজুর, সে ভাগা হ্যায়! হাম লোক হিঁয়া পার আনেসে সে জঙ্গলমে ঘুস্ গিয়া—বহুত ঢুড়কে বি মিলতা নেহি।"

সাহেব মনে মনে ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা—ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে!"

অতঃপর যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দেখ, তোমার নাম কীর্ত্তিবাস! আমরা তোমার সম্বন্ধে সকল প্রকার গুপ্ত সংবাদ রামশরণের কাছে পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশ অক্ষরে অক্ষরে মিলিতেছে; তুমি বহুরূপীবেশে ধূর্ত্ত জুয়াচোর এ স্থানে বাস করিয়া, নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার কর, দুঃখের বিষয় এতদিন আমরা এ বিষয়ে অপরিজ্ঞাত ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি, যে আজ তিনি রামশরণের মতি ফিরাইয়াছেন—সে তোমার সম্বন্ধে আমাদের সকল কথা জানাইয়াছে।"

যুবক সাহেবের মুখে এই কথা শুনিয়া আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য ইংরাজী ভাষায় সাহেবকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল, সাহেব তাহার নির্ভীকতা, কথোপকথন প্রণালী—ইংরাজী ভাষা জ্ঞান দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "কীর্ত্তিবাস! তুমি কে? তোমার অপরাধ স্বীকার কর, সাধু সন্ন্যাসী সামান্য বহুরূপী ব্যক্তি এত লেখাপড়া কিরূপে শিখিবার সুযোগ পাইলে, আর এ সুযোগ পাইয়া এ হীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কেন?"

কীর্ত্তিবাস কহিল, "হীন কার্য্য নয় সাহেব! আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাই অবিশ্বাসী স্বজাতিদ্রোহী বাঙ্গালী রামশরণকে বিশ্বাস করেছিলেম। আমি এ বিপদে বিচলিত নহি, যতদিন না বাঙ্গালী একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তোমাদিগের ন্যায় স্বজাতীর উন্নতিকামনায় চিত্ত সমর্পণ করিবে, ততদিন আমার ন্যায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর উচ্চ কার্য্যসাধন করিবার স্পৃহা বলবতী হইলেও, তাহা স্বজাতিদ্রোহীতার ফলে পণ্ড হইয়া যাইবে। দোষ আমার নয়—বাঙ্গালীর অদৃষ্টের।"

সাহেব কহিল, "কীর্ত্তিবাস! দেখিতেছি, তুমি স্বদেশপ্রেমিক—উচ্চ

হৃদয়বান্। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে বিষম অভিযোগ—আমরা আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তোমায় বন্দী করিতে বাধ্য।"

কীর্ত্তিবাস সহাস্যে কহিল, "বেশ, যদি আমায় বন্দী করিলে আপনাদের আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে—স্বচ্ছন্দে বন্দী করুন,কিন্তু সাহেব! রক্ষা করুন—এই অভাগিনী রমণী—আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জননী! ঐ হিন্দুর চিরপূজ্য দেবী-প্রতিমা, আর ঐ অদূরে অবস্থিত নিরাশ্রয় রোগ শোক কাতর অন্ধ আতুর ব্যক্তিদিগকে আপনি রক্ষা করুন। দোহাই আপনার সাহেব! আমি মরি—তাতে দুঃখ নাই, আমার এ বিপদে সহায়তা করিবার কেহ নাই—আমি পথের কাঙ্গাল—এই সকল অনাথ—পঙ্গুর সেবায় দেহ পণ করেছিলেম; আমার অভাবে যেন এরা মৃত্যু-মুখে না নিপতিত হয়।"

এমন সময়ে তথায় অন্ধ আতুরগণ আসিয়া কহিল, "সাহেব, ইনি আমাদের পালনকর্ত্তা—আশ্রয়দাতা।"

শ্যামাঙ্গিনী কহিল, "সাহেব, শুনেছি—তোমরা গুণগ্রাহী—মহত্ত্বের সমাদর কর। এ মহানুভব ত্যাগী পুরুষকে অযথা নির্যাতন করো না, দোষী সেই রামশরণ! ইনি তার গুরু—সে দুরাত্মা গুরুদ্রোহী—আমার উপর পশুবল প্রয়োগ করতে এসেছিল; তোমাদেরই মত এক সাহেব আমার মান রক্ষা করেছেন, তিনি যে কোথায়—তা বল্‌তে পারি না।"

সাহেব শুনিয়া কহিল, "প্রহেলিকা—রহস্যময় জটিল ঘটনা, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

জমাদার কহিল, "হুজুর, এ জবর মামলা হ্যায়?"

পাহারাওয়ালাগণ কহিল, "কেয়া তাজ্জব, কেয়া তাজ্জব!"

সাহেব পকেট হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া কীর্ত্তিবাসকে কহিল, "কীর্ত্তিবাস! রামশরণের সঙ্গে আমরা সকল স্থানে এক মত

হইতে না পারিলেও এ স্ত্রীলোকের ফটোর সঙ্গে এই আঘাতিতা রমণীর সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি। সমস্ত পুলিসের এলাকাভুক্ত থানায় এ ফটো আছে, ইনি হিন্দু মহিলা—বর্দ্ধমানের কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পুলিস সন্নিধানে এই ফটো ও অভিযোগ পাঠাইয়াছেন যে, এই মহিলা অন্যূন দশ হাজার টাকার গহনা লইয়া, কোন প্রবঞ্চকের সহিত অন্তর্হিতা হইয়াছে; সেইদিন হইতে তাহাদের বাড়ীর সরকারকেও পাওয়া যায় নাই—তাহাদের সন্দেহ এই যে, সেই সরকার এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছে। আমরা এতাবৎকাল এ অভিযোগের কোনও প্রতীকার করিতে পারি নাই; এই দেখ, সে ফটো—ইহার নাম শ্যামাঙ্গিনী। তোমার নাম কি মা?"

শ্যামাঙ্গিনী বিনীতভাবে কহিল, "সাহেব আমিই সে অভাগিনী—যে দুরাত্মা সরকার আমায় প্রলোভিতা করেছিল—সে আমার অলঙ্কারাদি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, আমায় ইনি পথ হ'তে অসহায় অবস্থায় এনে, এই মা কালীর পূজায় নিযুক্তা করেছেন।"

জমাদার কহিল, "হুজুর, রামশরণ বোলা হায়—এই ঔরাৎ এ আদমী কো পেয়ার করতা, ইসি আস্‌তে ইস্‌কো খবর ছিপাতা হায়।"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি কহিলেন, "তুমিই সে শ্যামাঙ্গিনী? কীর্ত্তিবাস! আমি তোমায় ছাড়িতে পারি না—এখন পুলিসে চল, আদালতের বিচারের উপর তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।"

কীর্ত্তিবাস কহিল, "বেশ, তবে আপনি এ সকল দীন দুঃখীদিগকে দেখিবেন—আপনার অর্থের অপ্রতুল হইবে না। এ বনভূমির ইতস্ততঃ বহু অর্থ পতিত আছে, তাহাতেই ইহারা বহু দিন প্রতিপালিত হইতে পারিবে।"

সাহেব ভাবিলেন, কীর্ত্তিবাস শ্যামাঙ্গিনীর গহনা বিক্রয় করিয়া কোন স্বার্থসিদ্ধির কামনায় এ অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। যাহা হউক, আদালতে সে সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এক্ষণে তুমি থানায় চল—যদি কেহ তোমার জামিন হয়, তাহা হইলে তুমি এ রোগীদিগের সেবা নিজেই করিও, নচেৎ বর্ত্তমান সময়ের জন্য আমি এই পুলিস প্রহরীদিগের দ্বারা এ সকল কার্য্য পরিচালনা করিব।"

কীর্ত্তিবাস কহিল, "আমি পথের ভিখারী—আমার জামিন কে হইবে সাহেব!" অতঃপর মনে মনে ভাবিল, "শঙ্করী! এত ক্লেশ, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগের কি এই পরিণাম? বৃথা চিন্তা—দুর্গতিনাশিনি, একি! আমার এ ঘোর বিপদকালে তোর ও বদনমণ্ডলে এখনও হাসিরাশি কেন? জগজ্জননী, দে মা! হৃদয়ে বল দে, আমি যেন সেই বলে সমস্ত নির্যাতন ঐরূপ হাসি মুখে সহ্য করতে পারি।" তার পর শ্যামাঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা! তুমি ভীতা হয়ো না—পরীক্ষাময় সংসারে গ্রহচক্রের আবর্ত্তনে পড়ে, আমাদিগকে নিত্য নূতন জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। বিপদে কাতর হয়ো না; জেনো, ঈশ্বর মঙ্গলময়—আমরা নিরপরাধী—তিনিই আমাদিগের সহায়।"

তৎপরে ইন্‌স্পেক্টরকে কহিলেন, "সাহেব! আমি প্রস্তুত।"

জমাদার কীর্ত্তিবাসকে থানায় লইয়া গেল। শ্যামাঙ্গিনী সাহেবের আজ্ঞায় তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল, আর পুলিস প্রহরীরা ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী সেই স্থানে প্রহরা কার্য্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন নিশা নিঃশেষিত হইয়াছিল, প্রভাতের বিহঙ্গম কুজনের সঙ্গে সঙ্গেই যুবক কীর্ত্তিবাসের এ ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা নানা স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরেন্দ্রনাথের চাতুরী

ননীগোপাল ভগ্নী অনুপমার দুঃখ দূরীকরণের অভিপ্রায়ে হরেন্দ্রের বাটীতে আসিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইল। সে এত দূর মদ্যপ ও বারাঙ্গনা প্রেমাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, যে সে বাড়ীতে বসিয়াই এখন মদ্যপান করিতে আর সঙ্কুচিত হইত না, রাত্রে খুব অল্পই বাড়ীতে থাকিত। ননীগোপালের কথা শুনিয়া হরেন্দ্রনাথ সুরা পান করিয়া জড়িতকণ্ঠে সহাস্যে কহিল,"সম্বন্ধি! বেশ বক্তৃতা দিচ্ছ, তা ভাই! সামলা মাথায় দিয়ে মামলা করতে যখন পাশ করেছ,তখন এ রকম একটু চাই বই কি?"

ননীপোগাল কহিল, "বলি, মদটা খাওয়া এখন রাখ না।"

হরেন্দ্র। কেন বাবা, তোমায় খাতির করতে হবে নাকি? তুমি ত আমার হেঁসেল ঘরের কুটুম—পর নও ত, আর এ রসে বঞ্চিত—নেহাত নাবালক, তোমায় বেশী কিছু বলা উচিত নয়।

ননী। বল্‌বে আর কি মাথা মুণ্ডু, এখন আমার কথাগুলো সব মনে আছে ত! বেশ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ কর। তার পর মদটা ছাড়্‌তে চেষ্টা কর, মিছে পয়সা ও শরীর নষ্ট করো না।

হরেন্দ্র। বন্ধ করে তোমার বোনের আঁচল ধরে বসে থাকি, কেমন? যাও বাবা সরে পড়, ওমন Gratis এ advise শুনে কাণে তালা ধরে গিয়েছে, সম্বন্ধি! তালা ধরে গিয়েছে।

ইহা শুনিয়া ননীগোপাল সহাস্যে কহিল, "বটে, দেখ—মানুষ বড়

দিন না কোন কিছু নেশা করে, ততদিনই ভাল ; আর একটু নেশা কর্‌তে শিখ্‌লেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মানুষের অধঃপতন ঘটে—দুর্ব্বলচিত্ত যে, সে নিজের অধঃপতন বুঝে উঠ্‌তে পারে না, তোমার সেই অবস্থা। তুমি পরের মেয়ের পাণি গ্রহণ করে, তাকে সুখে রাখ্‌বার জন্য একবারও ভাব না, দেবী প্রতিমাকে পায়ে ঠেলে, বিষময়ী ভুজঙ্গিনীকে বুকে ধরে আনন্দলাভের প্রয়াস কর।"

হরেন্দ্রনাথ আবার সুরা পান করিয়া কহিল, "ফুর্ত্তি চাই—ফুর্ত্তি চাই, সম্বন্ধি! এ সব কাজে আমোদ করা কি যার তার কাজ, দিল খোলসা থাকা চাই—তোমাদের মত মামলাওয়ালার এ সব কাজ কি ?"

"আমি এ সব লোকের সংসর্গও রাখি না। কি বল্‌ব, ভগ্নীপতি তুমি, ভগ্নীর মুখ চেয়ে তাই আসা। হায় জানি না, কালে মদ ও বেশ্যায় বঙ্গ সংসারের যুবকগণের আরও কত দূর অধঃপতন ঘটিবে।" এই বলিয়া ননীগোপাল প্রস্থানোদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ কহিল, "দেখ ননী, তুমি যদি ভাই! একদিন আমার মেয়েমানুষের বাড়ী যাও,তা হ'লে আমি চিরজীবনের মত এ বেশ্যালয়ে যাওয়া অভ্যাস ত্যাগ করব।"

ননীগোপাল ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিল, "আমি যদি একদিন তোমার সঙ্গে তোমার রক্ষিতার বাড়ী যাই, তাহা হইলে তুমি চিরজীবনের মত বেশ্যালয়ে যাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ কর। বেশ, আমি যেতে রাজি আছি। ভগ্নীর সুখের জন্য এ কার্য্য কর্‌তে আমি সম্পূর্ণ ইচ্ছুক।"

হরেন্দ্রনাথ কহিল, "তবে কাল রাত্রে সেখানে যাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা, কাল তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো।" এই বলিয়া ননীগোপাল প্রস্থান করিল।

হরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিল, "বাবা! সে মেয়েমানুষের পাল্লায় একবার তোমায় ফেল্‌তে পার্‌লে হয়; তার পর তুমি তাকে দেখে "তাক" হয়ে যাবে, আর ভুল্‌তে পার্‌বে না, তখন তোমার বক্তৃতা দেওয়া ঘুরে যাবে। মনে আছে আমার, আমি যখন সেদিন তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলেম, তুমি আমায় প্রথমে বাহিরের ঘরে বসাও—কেন না আমি বেশ্যাসক্ত, মদ্যপ। তার প্রতিশোধ চাই, আমার যত টাকা ব্যয় হয় হোক, কাল তোমার জন্য আমি নূতন পন্থা অবলম্বন কর্‌ব; ভাল ভাল মেয়ে মানুষ খুঁজে কাল সে ঘরে রাখ্‌ছি, দেখি তোমার মন বিগ্‌ড়ে যায় কি না।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শিবনাথের শেষ

বিবাহের পর শিবনাথ দুইদিন জ্বরে কাতর থাকায় বাড়ী আসিতে পারে নাই। তৃতীয় দিবসে ভগবতীচরণ বর-কনে লইয়া আসিয়াছিলেন, অমনি চুপে চুপে আসিয়াছিলেন; বাদ্যবাজনা কিছুই হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, তবে শিবনাথের আরোগ্য কামনাই তিনি অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন; বাদ্যবাজনায় তত মন দেন নাই। বসন্তকুমারী বৌ-বেটাকে বরণ করিয়া আনিল, সুরেন্দ্রনাথ যে সমস্ত জিনিস পত্র দিয়াছিলেন—তাহাতেই তাহার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। বিশেষতঃ যোগমায়া রূপবতী, তাহার সেই অনিন্দ্য রূপরাশি সন্দর্শনে বসন্তকুমারী মুগ্ধা হইয়াছিল—ততোধিক মুগ্ধ হইয়াছিল শিবনাথ। যোগমায়ার বয়স মাত্র পঞ্চদশ বৎসর, শিবনাথ যে অপার্থিক রূপলোভে যোগমায়াকে হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, সে যোগমায়া তাহার পাণি গ্রহণ করিলে, শিবনাথ নিজ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাবশতঃ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে নাই। আজ সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে, পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেণনীভ শয্যায় শয়ন করিয়া গভীর রাত্রে শিবনাথ ডাকিল, "যোগমায়া!" কোন উত্তর নাই! শিবনাথ আবার ডাকিল—তথাপি উত্তর পাইল না। অতঃপর সে উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল; দেখিল, ভূমিতলে পড়িয়া যোগমায়া নিদ্রা যাইতেছে। শিবনাথ এক হস্তে প্রদীপ, অপর হস্তে যোগমায়াকে ধাক্কা দিয়া ডাকিল, শিবনাথের আহ্বানে যোগমায়া উঠিয়া বসিল—শিবনাথ সেই স্তিমিত প্রদীপালোকে তাহার অবগুণ্ঠনাবৃত বদনমণ্ডলে

দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিল, "কি রূপ, মরি মরি—আহা, এ অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া আজ আমি ধন্য হইব। চারিদিন ইহাকে এ স্থলে আনিয়াছি, কিন্তু একদিনের জন্য আমার বাসনা পূর্ণ হয় নাই, আজ দেখি—এ সৌন্দর্য্যললামভূতা রমণী লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ করে কি না?" অতঃপর আপনার শয্যায় বসিয়া যোগমায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এদিকে এস।"

যোগমায়া অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া স্থির ধীরভাবে সেই স্থানে বসিয়া রহিল—শিবনাথের আহ্বানে ভ্রুক্ষেপ করিল না। শিবনাথ তাহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "হায়! মনুষ্যে যাহা মনে করে, তাহা ত পূর্ণ হয় না—ভবিয়াছিলাম,পূর্ণ যুবতী বিধবাকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিয়া সুখী হইব—বুঝি আমার সে আশা বৃথা। কি জানি—যোগমায়া কেন অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, আমার অসুখে সে প্রাণপাত পরিশ্রমে সেবা করিয়াছে, কিন্তু আমার নিকট হইতে এত দূরে থাকে কেন? আজ যা হবার হউক, যোগমায়াকে ছাড়িব না—সে আমার বিবাহিতা; দোষ কি, লজ্জা কি—আমার স্ত্রী, আমি তাহাকে হৃদয়ে ধরিব।" এই-ভাবিয়া সে যোগমায়ার সমীপে গিয়া তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কহিল, "ছি, এত লজ্জা কিসের, এস আমার কাছে এস! যোগমায়া! তুমি জান না, আমি তোমায় কত ভালবাসি—সুন্দরী তুমি, তোমার ঐ অনিন্দ্যরূপের খ্যাতি শুনিয়া, আমি মান-সম্ভ্রম, আত্মীয়-স্বজন সমাজবন্ধন জলাঞ্জলি দিয়া তোমায় বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু জানি না, তুমি কি ভাব—এত উদাসপ্রাণে কাকে ভাব? আমি তোমার স্বামী—আত্মগোপন করিও না, বল তুমি কি চাও? আমি সত্য বলিতেছি, তোমায় বড় ভালবাসি—তোমার মনতুষ্টিসাধনের জন্য আমি এ বিশ্বসংসারের সমস্ত সুখ হাসি মুখে ত্যাগ করিতে পারি।"

ইহা শুনিয়া যোগমায়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না—একবার মুখ উন্নত করিয়া আবার অবনত করিয়া ফেলিল, মস্তকে অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া দিল।

শিবনাথ তাহার অবগুণ্ঠন বলপূর্ব্বক খুলিয়া দিয়া কহিল, "যোগমায়া! বৃথা চেষ্টা, এ কয়দিন তুমি এখানে আসিয়াছ; ইহার ভিতরে আমি পীড়িত ছিলাম—আজ আমার দেহ, মন সুস্থ আছে; তুমি এরূপ ভাবে থাকিয়া আর কষ্ট দিও না। এস হৃদয়ে এস, আবার বলি—তোমায় আমি বড় ভালবাসি।"

যোগমায়া কোন কথা না বলিয়া একবার শিবনাথের দিকে চাহিল। সে চাহনি বিরক্তিপূর্ণ, প্রেমাসক্তির লেশমাত্র তাহাতে ছিল না; শিবনাথ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। গম্ভীরস্বরে ডাকিল, "যোগমায়া!"

এবার যোগমায়া কাতরনেত্রে তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; কোন উত্তর দিল না। শিবনাথ যোগমায়ার এ ভাব দেখিয়া কহিল, "যোগমায়া! তুমি কি আমার সহিত কথা কহিতে কষ্ট বোধ কর; বল, যদি তুমি আমার কাছে থাকিতে কোন রূপ দুঃখ পাও, তাহা হইলে আর আমি তোমার কাছে থাকিব না। আমি মদ্যপ—বেশ্যাপরায়ণ বলিয়া কি তুমি আমায় ঘৃণা কর? তা যদি হয়, তাহা হইলে জেনো, আমি তোমার জন্য সে সকল কুসংসর্গ ত্যাগ করিব। তোমার কাছে কাছে থাকিয়া সর্ব্বদা ও ভুবনভরা রূপ দেখিব।"

বারিধিবক্ষে বালির বাঁধ ভাঙ্গিলে যেরূপ জলস্রোত প্রবাহিত হয়, সেইরূপ যোগমায়ার হৃদয় মধ্যে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে সে শিবনাথকে অনেক কথা কহিল। সে সকল কথা বড়ই হৃদয়স্পর্শী, শিবনাথ যাহা শুনিবে বলিয়া কখনও কল্পনায় আনিতে পারে নাই; আজ

যোগমায়ার মুখে তাহা শুনিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। তাহার বাক্য রোধ হইয়া আসিল।

যোগমায়া কহিল, "আমি পরাধীনা বাঙ্গালীর মেয়ে। পিতার অমতে কোন কার্য্য করিতে পারি নাই; একবার ভেবেছিলাম—আফিম খেয়ে এ জীবনের অবসান করি, কিন্তু পিসী-মা আমায় তা কর্‌তে দেয়নি; তিনি আমায় তোমার শরণাপন্না হইতে বলেন, তুমি এক্ষণে আমার অভিভাবক—আমার পবিত্রতা তুমিই রক্ষা কর। আমি আমার পূর্ব্ব স্বামীর মূর্ত্তি প্রত্যহ ধ্যানে দেখি, তিনি আমার হৃদয়ে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। সে হৃদয়ে তোমায় কেমন ক'রে স্থান দি বল, তুমি আমার কথা শুন; আবার বিবাহ কর, তা হ'লে সুখী হ'বে—আমার আশা ত্যাগ কর। আমাদিগের মনের ভাব অপরে কেউ জান্‌তে পার্‌বে না; জান্‌লে তুমি, জানি আমি—আর যদি কেউ জেনে থাকে, তা হ'লে সে ঐ নিশার হৃদয়নিধি চন্দ্র, আর তার নিত্য সহচর নক্ষত্রনিচয় ও নৈশান্ধকার। পিতা আমার দম্ভ ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয়ে দশজনের অমতে এ কার্য্য করেছেন, তিনি রমণী-হৃদয় বুঝেন নাই; বুঝিলে এ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌তেন না। তুমি যদি আমায় ভালবেসে থাক—তা হ'লে আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। জঘন্য স্বার্থপূর্ণ লালসার বশবর্ত্তী হয়ে, আর আমায় সম্ভাষণ করো না।"

"বেশ, তাই হোক, আমি ভ্রমান্ধচিত্তে সুখের আশায় আকাশের চাঁদ ধর্‌তে গিয়েছিলেম, খুব শিক্ষা লাভ হয়েছে। ভগবান্, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও প্রভু!" এই বলিয়া শিবনাথ ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিল, আকস্মিক চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আসিল, যে জ্বর অল্প অল্প পরিমাণে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, আজ তাহা ভীষণভাব ধারণ করিল।

শিবনাথ শয়নাবস্থায় যোগমায়াকে ধীরে ধীরে ডাকিয়া কহিল, "যোগমায়া! বড় তৃষ্ণা একটু জল।"

যোগমায়া তাড়াতাড়ি শিবনাথের মুখে জল ঢালিয়া দিল। জল পানান্তর শিবনাথ কহিল, "উঃ বড় শীত! গায়ে ঢাকা দাও, যোগমায়া! যেখানে যত কিছু গাত্র বস্ত্র পাও, আমার উপরে চাপা দাও; দারুণ শীত, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে।"

যোগমায়া গৃহস্থিত কাপড় দুই-একখানি লইয়া শিবনাথের গাত্র আবৃত করিল। তাহাতে তাহার শীত ভাঙ্গিল না, সে আরও কাঁপিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া যোগমায়া ভীতান্তঃকরণে গৃহ হইতে বাহির হইয়া শাশুড়ীকে খবর দিল। বসন্তকুমারী ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "শিবু, শিবু, কি হয়েছে বাবা?"

শিবনাথের তখন বিষম জ্বর আসিয়াছিল, সে নানারূপ প্রলাপ বকিতে লাগিল। বসন্তকুমারী তাহার গাত্রে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিল, "ইস্, গা যে পুড়ে যাচ্ছে।"

শিবনাথ কহিল, "চাপা দাও, চাপা দাও—বড় শীত।"

বসন্তকুমারী যোগমায়াকে দেরাজ খুলিয়া গায়ের কাপড় বাহির করিতে বলিল। যোগমায়া তাহাই করিল, তার পর সেই গভীর রাত্রে তাহারা শিবনাথের পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কালী দাসী

হরেন্দ্রনাথ ননীগোপালকে রমণীর সৌন্দর্য্যানলে ভস্ম করিবার অভিপ্রায়ে আজ তাহার রক্ষিতা কালী দাসী নাম্নী বেশ্যার আলয়ে মহা আনন্দোৎসবের আয়োজন করিয়াছে। সে বহু অর্থ ব্যয়ে নানা স্থান হইতে বাইজী আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে সুরা পানে উত্তেজিত করিতেছিল; কালী দাসী অতিশয় চতুরা, সে অনেকদিন হইতে হরেন্দ্রের অধীনে থাকিয়া তাহার মন বুঝিয়া লইয়াছিল; এ নিমিত্ত আজ সে হরেন্দ্রের জয় কামনায় ননীগোপালকে আয়ত্বাধীন করিবার আশায় সুবেশ ধারণ করিয়া বাইজীদিগকে গান গাওয়াইয়া ঠিক করাইয়া লইতেছিল। এমন সময়ে তথায় হরেন্দ্রনাথ আসিয়া কহিল, "কি মাইডিয়ার, সব ঠিক—এইবার তাকে নিয়ে আসি। দেখ, এতগুলো মেয়ে মানুষে যদি সে শালাকে না পটাতে পার, তা হ'লে বাবা তোমাদের তারিফ নেই জানব।"

ইহা শুনিয়া কালী দাসী কহিল, "আন না—কে তোমার সে শালা আছে, একবার দেখি, আমরা মনে করলে তোমার শালার শালাকে পর্য্যন্ত বশ ক'রে রাখ্‌তে পারি।"

"আচ্ছা দেখা যাক্ এক চাল চেলে, আমি এখন তাকে আন্‌তে চল্‌লেম," বলিয়া হরেন্দ্রনাথ প্রস্থান করিল।

কালী দাসী ভাবিল, "আচ্ছা, দেখি—নারীর নয়নের বিলোল কটাক্ষ সঞ্চালনে মুনির মন টলে যায়, আর সে অবিবাহিত কিশোর

যুবককে বশ করতে পারি কি না। আমাদের সঙ্গীত শ্রবণের জন্য এসে, কত শত ব্যক্তি প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আর সে যুবককে সঙ্গীত, আসক্তি, অনুরাগ বলে কি বশ করতে সক্ষম হ'ব না। আজ আমার জীবনের পরীক্ষার দিন, যদি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, যদি আমার চেষ্টা ফলবতী হয়, তা হ'লে বুঝব যে, আমার রূপ আছে; সে রূপের গুণে আশ্রয়প্রার্থীর উপকার করতে সক্ষম হয়েছি। হরেন বাবুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পেরেছি। অতঃপর সে বাইজীদিগকে সুরাপান করাইয়া কহিল, "এস ভাই, সকলে এই সুরা পান ক'রে সানন্দচিত্তে আবার সেই মন মাতোয়ারা সঙ্গীত গাই। সে যুবকের চিত্তবিনোদন করতে পারলে আজ আমরা সকলে পরিতৃপ্ত হব। বাইজীগণ গাহিল ;—

গীত।

সঁইএগ মেরে চুপ্‌কে রহো, আওরে দিন আওরে হিঁয়া।
ম্যায়সে মজপুকে লিয়ে, লেলিকা দিল রয়্‌তা পিতা॥
রাত ভোর নিদ নহি, দিন ভোর চাম নহি,
তেরি মহবৎমে মুঝে লাগি ফাঁসি ইয়ানে লিয়া।
হিয়াপর বস্তি কর, পিরীতকি কিস্তি চঢ়ো,
পিরীতি বিষম নদী, কুল কিনারা কহো কাঁহা।

তাহারা যখন সঙ্গীত ও নৃত্যে বিভোর হইয়া সেই গৃহ আমোদিত করিতেছিল, এমন সময়ে হরেন্দ্রনাথ ননীগোপালকে লইয়া তথায় প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া বাইজীগণ গান থামাইল, তাহা দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ কহিল, "চলুক, চলুক—আজ আনন্দের দিন, হর-দম ফূর্ত্তি চালাও।" তৎপরে স্বহস্তে সুরার বোতল লইয়া পাত্রে ঢালিয়া সকলকেই তাহা পান করাইল, পরিশেষে নিজে পান করিয়া একটা সোফায় বসিয়া পড়িল।

ননীগোপাল তথায় উপস্থিত হইলে তাহার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। সে সন্ত্রাসিতভাবে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এই বেশ্যা-গার, কি জঘন্য স্থান ; হায়, জানি না—কেমন করিয়া লোকে এখানে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এই সকল লজ্জাহীনা বারাঙ্গনা অর্থের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া না করিতে পারে, এমন কার্য্য ত কিছু দেখি না। দয়াময়! সাধু ও সদুদ্দেশ্যে ভগ্নীর দুঃখ দূরীকরণে আমি এ স্থলে আসিয়াছি, আমার মুখ রক্ষা কর, দোহাই তোমার ঈশ্বর! আমার হৃদয়ে তোমার স্মৃতি পূর্ণমাত্রায় জাগাইয়া রাখ—আমি যেন তিলার্দ্ধও না বিচলিত হই।"

ননীগোপালকে সেইরূপে এক স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ কহিল, "কিহে ইয়ার, তুমি একটু বোস না। নেহাত দাঁড়িয়ে থাকবে, দু'-একটা গান শোন।"

ননীগোপাল কহিল, "হরেন বাবু! তোমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর, তুমি বলেছিলে যে, একদিন তুমি আমায় তোমার রক্ষিতার কাছে আনবে, তবে এ সকল বাইজীর ঝাঁক জুটিয়েছ কেন?"

হরেন্দ্র। কেন হে, তুমি ত বড় বেরসিক পুরুষ দেখ্‌ছি, এদের চাঁদ মুখ কি তোমার পছন্দ হয় না?

ননী। ভাই, দোহাই তোমার, ঈশ্বর সাক্ষী—তোমার কথামত কাজ কর।

"আচ্ছা বেশ, তুমি এ স্থানে বোস—আমি এঁদের অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া কালী দাসীকে হরেন্দ্রের সম্মুখে আনিয়া কহিল, "এই আমার রক্ষিতা, তুমি আলাপ কর।" অতঃপর সে বাইজীগণকে লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল, যাইবার সময় সে কালী দাসীকে ননী-গোপালের মনোরঞ্জন করিতে ইঙ্গিত করিয়া গেল।

কালী দাসী ননীগোপালের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "আপনারই নাম ননীগোপাল বাবু!"

ননী। আজ্ঞা হাঁ।

"আমায় এত মান্য করিবার আবশ্যক নাই, যদি দয়া ক'রে আজ অধিনীর গৃহে পদার্পণ করেছেন, তা হ'লে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন কেন? একটু বসুন।" এই বলিয়া কালী দাসী একখানি চেয়ার তাহার সমীপে স্থাপন করিল।

ননীগোপাল সেই চেয়ারে উপবেশন করিল।

অতঃপর কালী দাসী একটু সুরা লইয়া তাহাকে পান করিতে অনুরোধ করিলে ননীগোপাল কহিল, "আপনি পান করুন, আমি উহাতে অভ্যস্ত নহি।"

ইহা শুনিয়া কালী দাসী সুরার বোতল রাখিয়া পান দিতে অগ্রসর হইল।

ননীগোপাল কহিল, "আমি পান খাই না, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

কালী। না ব্যস্ত নহি, আমার সৌভাগ্য যে আজ আপনার মত ভদ্রলোকের পায়ের ধূলা ঘরে পড়েছে, তামাক খান।

ননী। ইহাতেও অনভ্যস্ত।

"বাঃ—হরেন বাবুর মুখে আপনার অশেষ গুণের কথা শুনেছিলেম, কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেম। আপনার এই নির্ম্মল চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে, আপনাকে আমি ভালবেসেছি, দয়া করে পায়ে ঠেল্‌বেন না।"

এই বলিয়া সে গাহিল;—

গীত।

(আমি) তোমায় বড় বেসেছি ভাল।
জীবন যৌবন কায়মনপ্রাণ
স'পেছি চরণে যা কিছু ছিল॥
অধরে মধুর হাসি, ছড়াইয়ে দশ দিশি,
এস হে বঁধু এস, হৃদি সিংহাসনে বস,
আমার এ আঁধার প্রাণে ফুটুক আলো।
ঘুচে যাক্, দূরে যাক্ মনের কালো॥

গান সমাপ্ত করিয়া কালী দাসী ননীগোপালের গাত্রে হস্ত স্থাপন করিবার উপক্রম করিয়া কহিল, "আসুন—সরে আসুন।"

ননীগোপাল চকিতভাবে গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "আমায় স্পর্শ কর্‌বেন না, আমি অবিবাহিত। পর নারী স্পর্শ করা আমি মহাপাপ মনে করি।"

কালী। তা হবে না—আপনি আমার হন, আমি আপনার সহ-বাস কামনা করি। মরি মরি—কি সুন্দর রূপ, কি চারুচন্দ্রাননের গঠনাকৃতি, নির্দ্দয় হবেন না; আমি নারী হয়ে লজ্জাহীনার ন্যায় আপ-নার পায়ে ধর্‌ছি, আপনি আমার হন।"

ননী। আপনি কি বল্‌ছেন? আমার বন্ধুর রক্ষিতা আপনি, আমার সঙ্গে আপনার এরূপ আচরণ শোভা পায় না। আমি দীন-দরিদ্র—কেবল বন্ধুর অনুরোধে এ স্থলে আসিয়াছি, জীবনে এই প্রথম—বোধ হয় এই শেষ।

কালী। শেষ কেন—আপনি আমার হ'ন, ও রূপের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকিত হয়েছে,আমি আপনাকে হৃদয় দান করিয়াছি।

ননী। আমার এ রূপ দেখিয়া যদি আপনি ভালবাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ভালবাসা অচিরস্থায়ী—এ রূপ ক্ষণভঙ্গুর, এই আছে, এই নাই। রূপের ভালবাসায় কে কোথায় সুখী হয়েছ বলুন? বৃথা কেন বন্ধুর হৃদয়ে কষ্ট দিবেন? ভাল বাসুন তাঁহাকে, যিনি অক্ষয়, অব্যয়, অচিন্ত, যাঁহার রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত।

কালী দাসী কহিল, "আমি আপনার রূপে আত্মহারা— গুণে মুগ্ধা। তাই আপনার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্রবান্ পুরুষের সংসর্গ কামনা করি।"

এই কথা শুনিয়া ননীগোপাল কহিল, "মা! যদি তুমি আমার নির্ম্মল চরিত্রগুণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই চরিত্র যাহাতে নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, অধিকতর পবিত্রভাবে গঠিত হয় তাহার ব্যবস্থা কর। ভালবাসা স্বর্গীয় সামগ্রী! পিতা ভালবাসিয়া কন্যা ও পত্নীকে চুম্বন করিয়া থাকে, একই ভালবাসা চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। তুমি যদি আমায় ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে পুত্রস্নেহে সেই ভালবাসাকে পরিণত কর, আমি তোমায় মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করি।"

কালী দাসী ইহা শুনিয়া কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া সবিস্ময়ে ক্ষণকাল ননীগোপালের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার পর কহিল, "কৈ তুমি আজ আমার প্রাণে এ পবিত্র ভাবের উন্মেষ করিয়ে দিলে, আমি কলুষিতা চরিত্রসম্পন্না বেশ্যা, কুপথগামিনী, তোমার পবিত্র চরিত্র কলুষিত হবার নয়। পুত্র! তোমার অনিষ্ট কামনায় হরেন্দ্র বাবু এ স্থলে এনেছিলেন, কিন্তু আর না—আমি কায়মনপ্রাণে তোমার ইষ্ট কামনা করি।"

ননীগোপাল বলিল, "মা! তোমার ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি বড় সুখী হলেম। এই রূপ—যাহার জন্য হরেন্দ্রনাথ তোমায় এত ভালবাসে—তাহার অভাবে তোমার কি দশা হবে মনে কর দেখি? যে

নরাধম নিজ পরিণীতা স্ত্রীকে অযত্ন করিয়া স্বার্থপূর্ণ ভালবাসার চক্ষে তোমায় এত যত্ন করে, সে তোমাকে যে ঐ রূপাভাবে ছিন্নগ্রন্থী বসনের ন্যায় একদিন ত্যাগ করিবে, তাহা কৃত নিশ্চয়! তুমি স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ, মৃত্যুর পর তোমার কি গতি হইবে? এ ধরাধামে আসিয়া তুমি শত শত শুভ কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিজ দেহ বিক্রয় করিয়া, কি হেয়তম কার্য্যে চিত্তনিবেশ করিয়াছ? মা! পরকাল ভাব, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়া সৎকর্ম্মে মতি স্থির কর।"

কালী। পুত্র! আজ হ'তে এ পাপবৃত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া আমি বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করে কাশীবাস কর্‌ব। জীবনে অনেক পাপ করেছি, কত যুবকই না আমার প্রেমকণার প্রার্থী হ'য়ে, আমায় সর্ব্বস্ব দান করে গিয়েছে; আমি সে সকল বিষয় পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে পড়েছিলেম, একদিনও পরকাল ভাবি নাই—ঈশ্বর চিন্তা করি নাই। আজ সত্য সত্যই তোমার ও দেবোপম মূর্ত্তি দর্শনে আমার হৃদয়ে দেব ভাবের উদয় হয়েছে।

তাহারা যখন পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে তথায় হরেন্দ্রনাথ সুরাপানে উন্মত্তভাবে হেলিয়া-দুলিয়া আসিয়া কহিল, "কি সম্বন্ধি! রসালাপ চল্‌ছে কেমন বল?"

ইহা শুনিয়া কালী দাসী কহিল, "সরে যা পাষণ্ড! তুই এত নীচ যে, একজন নির্ম্মল চরিত্রবান্ যুবককে এ স্থলে কৌশলে আনিয়ে তার সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছিলি। আর আমি সে কালী দাসী নই—আমার চৈতন্যোদয় হয়েছে, এ পাপ পথ হ'তে আজ আমি পুণ্যের উজ্জ্বল আলোক দেখ্‌তে পেয়েছি; আমি বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করেছি। তুমি আর এখানে এস না, আর এখানে আমার দেখা পাবে না।"

ননীগোপাল কহিল, "হরেন্দ্রনাথ, ভাই! আমি আমার প্রতিজ্ঞা

পালন করেছি। এবার তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর, এ ত্যাগময়ী রমণীকে আমি জননীর ন্যায় জ্ঞান করি; ইনি উদারহৃদয় সম্পন্না।"

হরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "ননী, ননী, একি রহস্য ভাই! তুমি কে? তোমার মুখে আজ আমি কি এক দিব্য জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি। জানি না, আজ তুমি কি শুভক্ষণে এ বেশ্যাগারে পদার্পণ করেছিলে?"

ননী। প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর, নিজ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়ো না।

হরেন্দ্র। তোমার সমীপে আমি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত। জীবনে যা কখনও হয় নাই, যাহা হবে বলে স্বপ্নেও ভাবি নাই—আজ তাহা প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। যাকে আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান ক'রে, এতকাল ভালবেসেছিলেম, তার দ্বারা আজ আমি উপেক্ষিত—উপেক্ষিত কেন, বিতাড়িত হলেম।

কালী দাসী সগর্ব্বে কহিল, "যাও, আর আমায় ভুলিও না—অমন সৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে, আর কখনও বারাঙ্গনাপ্রেমে মুগ্ধ হয়ো না। ঘরে স্ত্রী আছে, তাকে নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা কর; যদি আমার সঙ্গে কখনও দেখা কর্‌বার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই কাশীধামে বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে যেও। জীবনের অবশিষ্টকাল আমি সেই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন ও সেবায় জীবন উৎসর্গ কর্‌লেম।"

"বেশ, তবে আজ এই শেষ দেখা, বাইজীদের আমি বিদেয় করেছি, যদি পারি আমি তোমার সেই নূতন বেশ বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে গিয়ে দেখ্‌ব। এস বন্ধু! তোমার জয়লাভে আমি সুখী।" এই বলিয়া হরেন্দ্রনাথ ননীগোপালকে লইয়া চলিয়া গেল।

কালী দাসী ভাবিল, "মন, তোমার সুদিন উপস্থিত—চল, উচ্চ কার্য্যে ব্রতী হইবে।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোকদ্দমায় শ্রীশচন্দ্র

শ্রীশচন্দ্র আজ অফিষ হইতে বিস্তর কাগজ-পত্র আনিয়া সন্ধ্যার পর স্বীয় শয়নকক্ষে বসিয়া এক মনে পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কিরণশশী আসিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় স্বীয় হস্তে আবৃত করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, কর কি, ছাড় ছাড়, আমার মাথা গুলিয়ে গেল।"

ইহা শুনিয়া কিরণশশী সস্মিতবদনে কহিল, "তা ত বাবারই কথা, দিন রাত অত কাগজ-পত্র ওল্‌ঠালে কখনও মাথা ঠিক থাকে কি ?"

"না, একটা মজার মোকদ্দমা জুটেছে।"

"সে কি ?"

একটা ভিখারী যুবক এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে ভুলিয়ে এনে, খুড়োর জঙ্গলে রেখে দেয়। সে স্ত্রীলোকের বিস্তর অলঙ্কার ছিল, যুবক তাহা আত্মসাৎ করে। যাদের মেয়ে তাহারা পুলিসে জানান দিয়ে রেখেছিল, পুলিসের কার্য্য তৎপরতায় যুবক ধরা পড়েছে, এখন যুবক বলে সে যুবতীকে অসহায়া অবস্থায় দেখে, নিজ বাস স্থানে আশ্রয় দিয়েছিল—আর যুবতীও বলে যে যুবক নির্দ্দোষ, সে তার কোনও অলঙ্কার নেয়নি, বরঞ্চ সে তাহার দ্বারা বিশেষ উপকৃতা।"

"আমার বোধ হয়, যুবতী সে যুবককে ভালবাসে।"

"হাঁ, এত লোক থাকৃতে আর ভালবাসার পাত্র খুঁজে পেলে না যে, সে একটা পথের ভিখারী ছোঁরাকে ভালবাস্‌বে। এখন সে যুবক

স্ত্রীলোককে বলছে মা, যুবতী বলে পিতা। শিয়ালদহের কোর্টে মোকদ্দমায় তাহারা পরস্পরে মাতাপুত্র ব'লে সম্বোধন করে। এ কেসটা বড়ই রহস্যপূর্ণ—শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট কাগজ-পত্র দেখে-শুনে মোকদ্দমা উপস্থিত মুলতুবি দিয়েছেন। যাঁদের মেয়ে, তারা খুব লড়ছে—আমায় বিজ্ঞতম উকিল জেনে বিস্তর টাকা দিয়েছে, আমি যে যে উকিল ব্যারিষ্টার নিয়োগ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করছি, তাঁদেরই নিয়োগ করেছি। ফরিয়াদি পক্ষে এবার যত নামজাদা বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার, আর আসামীর পক্ষে কে দাঁড়িয়েছে জান ?"

"হাঁ, আমি তোমার ঐ সামলা মাথায় দিয়ে আদালতে হাজির থাকি কি না, তাই উকিল ব্যারিষ্টার চিনব।"

"আহা—তা কেন, শোন—আসামীর পক্ষে প্রথমে কেউ দাঁড়ায়নি, এখন শুনছি তার পক্ষসমর্থন করেছে, দাদার বড় ছেলে—সেদিনের পাশ করা ছোঁরা—ননে।"

"বড় ঠাকুরের ছেলে ননী ? ওমা—সে আবার কবে উকিল হল ?"

"এই হালে হয়েছে—ছোড়া এম এ, বিল পাশ করে, বাপের পশার যোগার করবার চেষ্টায় আছে। আমি থাকতে তা হচ্ছে না, কি স্পর্দ্ধা বল দেখি, আবার বিপক্ষে দণ্ডায়মান।"

"তাই ত, তার দেমাক ত কম নয়! যাক্ ও ননী হেরে যাবে, তা হাগা—সে যুবকের কি কোন অভিভাবক নেই ?"

"থাকলে কি আর সে রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াত ?"

"কে কখন কি ভাবে থাকে, তা বুঝা যায় কি, এই দেখ না, রামায়ণে পড়েছি—রাবণ রাজা সন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষা করতে এসে সীতাহরণ করেছিল। বাহিরে সাধুর বেশ, অন্তরে কলুষ ভাব। এ যুবকের কোন সাধু উদ্দেশ্য থাকতে পারে।"

"হাঁ, লোকটা এখন সংসারত্যাগী পরোপকারী ব'লে আপনাকে প্রমাণ করাতে চেষ্টা করছে। স্ত্রীলোকটী তার অভিভাবকের অধীনে থেকে সুচিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে রয়েছে, এ যুবকের একজন সহকারী ছিল—সে পুলিসে খবর দেয় যে, যুবক তার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণের আশায় যুবতীকে হত্যা করতে গিয়েছিল। তার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে, যা হোক্, এবার এ সব রহস্য আমরা প্রমাণ করব।"

"তা—যা হয় করো, এখন এস—রাত্রে আহারের সময় হয়েছে, খেয়ে আমাদের অব্যাহতি দাও।"

"বেশ কথা—চল," এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র কিরণশশীর সহিত আহারে চলিয়া গেলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্য্যয়

শিবনাথ জ্বরাক্রান্ত হইবার দুই-একদিন পরই তাহার গাত্রে বসন্ত রোগের সকল চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াছিল। সে রোগ এত ভীষণ ভাব ধারণ করিল যে, অনেক যত্ন, সেবা চিকিৎসায়ও কোন প্রতিকার হইল না, সপ্তাহের মধ্যেই তাহার নশ্বর দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণ-পক্ষী পলায়ন করিল। সুরেন্দ্রের অর্থবল, যোগমায়ার অপরিমেয় করুণা, বসন্ত-কুমারীর সহস্র হা হুতাশ, কিছুরই মুখ না চাহিয়া দুর্দ্ধর্ষকাল আপন কবলে শিবনাথকে টানিয়া লইল। ভগবতীচরণ শোকপূর্ণ হৃদয়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সহসা এ দুর্ঘটনায় এত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে দুই-একদিন তিনি অফিসে যাতায়াত বন্ধ রাখিয়া লোকসমাজে মুখ দর্শনদান করেন নাই। কিন্তু বিপদ কখন একাকী আসে না—যখন মানবের সুখের সময় আসে, তখন কেহ বড় একটা জানিতে পারে না, ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষিতে নারিকেল মুচিতে জল সঞ্চয়ের ন্যায় সৌভাগ্যবান্ পুরুষের ধনৈশ্বর্য্যের সমাগম হয়, আর যখন বিপদ আসে, তখন পর্ণকুটীরে করিযূথ প্রবেশ করিলে যেমন সে স্থান হতশ্রী হয়, সেইরূপ দুর্ভাগ্যবান্ পুরুষের সংসার একে-বারে ছারখার হইয়া যায়। একটির পর একটি, তার পর আর একটি করিয়া বিপদ আসিয়া পড়ে। সুরেন্দ্রনাথের এখন এই শেষোক্তরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, শিবনাথের মৃত্যু হইলে পর যোগমায়া টাইফয়েড্ জ্বরা-ক্রান্তা হয়; সে রোগ অতি ভীষণ, প্রথম আক্রমণেই যোগমায়ার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। হেমলতা যোগমায়াকে বড় ভালবাসিত, জামাতার

অসুখে সে তাহাদের বাটীতে গিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; শিবনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বদিন হইতে যোগমায়ার জ্বর হয়, পরে তাহার বৃদ্ধি; সেই কারণে বসন্তকুমারী হেমলতাকে তথায় থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ একাকী গৃহে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদাই নিজ অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেন, আজ অপরাহ্নকালে তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছেন, "বৃথা চেষ্টা, এতদিনে বুঝিলাম—পুরুষকার কিছুই নহে, অদৃষ্টই সার। যোগমায়ার বিবাহে আমি লোকলজ্জা, মান, সম্ভ্রম, বিপুল অর্থ নষ্ট করিয়াও কোন শুভ ফল পাইলাম না। বৈধব্য-যন্ত্রণাভোগ তাহার অদৃষ্টলিপি, নতুবা সহসা শিবনাথের মৃত্যু হইবে কেন? সে বলিষ্ঠ সুস্থ যুবক, যোগমায়ার ভাগ্য দোষেই কালকবলিত হইয়াছে। আমার সবই গেল, যে সকল স্বার্থপর ব্যক্তি যোগমায়ার বিবাহ দিবার জন্য আমায় সহায়তা করিয়াছিল, বিবাহের পর আমি সমাজচ্যুত হইলে, তাহারা আমায় একে একে ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই এখন সমাজের দোহাই দেয়, একদিন এ হিন্দুসমাজের অতুলনীয় প্রভাব ছিল, এখন সে ভাব শিথিল হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।" তিনি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তথায় ভগবতীচরণ অশ্রু বিগলিতনেত্রে ভগ্নস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি সংবাদ বেয়াই মশাই!"

ভগবতীচরণ কহিলেন, "বিপদের উপর বিপদ, শিবনাথ আমাদের ফেলে গিয়াছে—আজ আবার বৌ-মাও চ'লে গেল, কোনও রকমে বাঁচাতে পারা গেল না। তার মৃত্যু দেখে বেয়ান মূর্চ্ছা গিয়েছেন, অনেক কষ্টেও তাঁর চৈতন্য হয় নাই—একবার আসুন। হায় হায় কর্পূরের মত সব উপে যাচ্ছে।

সুরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, "যোগমায়া মরেছে ? বেয়াই মশাই একি হ'ল !"

ভগবতীচরণ অবনত মস্তকে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "অদৃষ্ট বেয়াই—অদৃষ্ট ! বৃথা চিন্তা, ধৈর্য্য ধরুন। মৃত্যুর পথ রোধ করা এ মানব শক্তির অতীত।"

সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিলেন, "হৃদয় ! কঠোর হও, ভয় পেও না, সমাজের শ্লেষ নিন্দা উপদেশ উপেক্ষা করিতে যেমন কঠোর হয়েছিলে, তার অপেক্ষা আরও কঠোর হও, আকাশের ভীমবজ্র বুক পেতে নিতে হবে। প্রকৃতি—আমি প্রস্তুত, তোমার ও ভ্রূকুটিকুটিল-নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমি বিচলিত হ'ব না।"

তাঁহাকে এইরূপে চিন্তিত দেখিয়া ভগবতীচরণ কহিলেন, "বেয়াই, দুঃখ পরে হ'বে, উপস্থিত আমাদেরই বুক বেঁধে সকল কাজ কর্‌তে হ'বে। আমরা সমাজচ্যুত—সাধারণে আমাদের এ অবস্থা বিপর্য্যয়ে দুঃখ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভব কর্‌বে।"

"চলুন—প্রাক্তনের ফলভোগ করা যাক্।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ভগবতীচরণের সহিত যোগমায়ার সৎকারসাধন করিতে অগ্রসর হইলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিচার

আজ শিয়ালদহ কোর্টে কীর্ত্তিবাসের বিচারের দিন, আদালতে লোক ধরে না। সকলেই এ বিচারের ফলাফল দেখিবার জন্য আকুল প্রাণে বিচারকের মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন। কীর্ত্তিবাসকে কেহই জানিত না, তবে একটা সাধু পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিয়া বিচারাধীন হইয়াছে শুনিয়া, কৌতূহল বশে অনেকেই এ মোকদ্দমায় দিন উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম দিনে কীর্ত্তিবাসকে দেখিয়া জন-সাধারণের মনে এক সন্দেহের উদয় হয়, সে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আজ দলে দলে লোক আসিয়া আদালতে সমবেত হইতেছে। যথাসময়ে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, বিচারাসনে বসিয়াছেন—সর্ব্বলোকপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ র‍্যাণ্ডেল।

শ্যামাঙ্গিনীর অভিভাবক হইয়া সেই সতীন পুত্রগণ শ্রীশচন্দ্র ও অন্যান্য উকীল ব্যারিষ্টারের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল, পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের মত শ্যামাঙ্গিনী যথা স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। এমন সময়ে বন্দীভাবে কীর্ত্তিবাসকে কাটগড়ায় আনীত হইল, আজ তাহাকে দেখিবামাত্র জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, এই ত সে পাগলা—এ কখনও কুকার্য্যে রত হইতে পারে না, কখনও না—কোন দুষ্ট লোকে ইহাকে বিপদে ফেলিয়াছে, এ পাগলা সরল উচ্চ হৃদয়বান্। পুলিস-প্রহরীরা এ গোলযোগ থামাইতে বড় রুক্ষভাব ধারণ করিয়া অনেক লোককে তথা হইতে বিতাড়িত করিল।

অতঃপর ননীগোপাল কীর্ত্তিবাসের পক্ষসমর্থন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে

বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আজ এই যে আসামী আপনার সন্নিধানে বিচারার্থ আনীত হইয়াছে, ইহার পক্ষসমর্থন করিয়া আমি বলিতেছি, এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—কোন দুষ্ট লোকে ইহাকে এ বিপদে ফেলিয়াছে। আমি যত দূর ইহার বিষয় অবগত আছি, তাহাতে জানি এ পরোপকারী, দীনের প্রতিপালক, নিজে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়াও পরের অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত। আর যে অভিযোগ ইহার উপর আরোপিত হইয়াছে, সে অপরাধ একজন ত্যাগী নির্ব্বিরোধী যুবকের দ্বারা কখনও হইতে পারে না। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই ইহার চরিত্রের প্রশংসা করেন, এই শিক্ষিত যুবক সাহেব এই বন্দীর চরিত্রগুণে মুগ্ধ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। সাহেব কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে এ বন্দী এরূপ জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত আছে বলিয়া আমার প্রতীতি হয় না।"

অতঃপর শ্রীশচন্দ্র বন্দীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এই বন্দী আমার মক্কেলের বিমাতাকে প্রলোভিতা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। সে পুলিসের কার্য্যদক্ষতায় ধরা পড়িলে এখন সাধু ত্যাগী পুরুষ বলিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়।"

ননীগোপাল শ্রীশচন্দ্রের কথায় নানারূপ তর্ক যুক্তি প্রদর্শন করিল। আরও ম্যাজিষ্ট্রেটকে কহিল, "ধর্ম্মাবতার! সাধারণ্যে এ বন্দী সাধু বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয় নাই। জনসাধারণ ইহাকে অন্তরের সহিত ত্যাগী সাধু বলিয়া জানে—সেইজন্যই সকলের এত আগ্রহ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় বন্দীর স্বীকার পত্র লইয়া কহিলেন, "আমি এই বন্দীর আত্ম স্বীকার পত্র পাঠে যত দূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে এ বন্দীকে সরল হৃদয়বান্ বলিয়াই বোধ হয়—আর ফরিয়াদী পক্ষে যে

স্ত্রীলোকের স্বীকার পত্র দেখিতেছি, তাহার কোনটীই এ বন্দী যুবকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না।"

ইহা শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র সাগ্রহে কহিলেন, "হুজুরের সন্নিধানে এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে, সে রমণী যে কোন কারণেই হোক্, এ যুবকের প্রতি আসক্তা—সেইজন্য সে এই যুবকের বিপক্ষে কোন দোষারোপ করে নাই, আমার মক্কেলের প্রদত্ত এই তালিকা দেখিলেই বুঝিবেন যে, সে রমণীর গাত্রে অন্যূন দশ হাজার টাকার অলঙ্কার ছিল, যুবক তাহা বিক্রয় করিয়া এইরূপ অভিনব উপায়ে দিনপাত করিতেছিল" এই বলিয়া তিনি একটি অলঙ্কারের তালিকা ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রদান করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি বলিতে চান যে কীর্ত্তিবাস তাহা বিক্রয় করিয়াছে।

শ্রীশ। হাঁ ধর্ম্মাবতার! নচেৎ সে এত টাকা পাইবে কোথা হইতে?

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইহার নিকটে কি অনেক টাকাকড়ি পাওয়া গিয়াছে?

শ্রীশ। পুলিসের তদারকে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তৎপরে ইন্‌স্পেক্টরের ডাক হইল, তিনি মুড়োর জঙ্গলের স্থানে স্থানে যে সকল টাকা পাইয়াছিলেন। তাহার তালিকা দাখিল করিলেন, সে টাকা বড় অল্প নহে—প্রায় দুই হাজার হইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সে তালিকা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এত টাকা আছে?"

ইহা শুনিয়া ননীগোপাল যুবকের পক্ষসমর্থন করিয়া কহিল, "হাঁ ধর্ম্মাবতার! কিন্তু এ টাকা ঐ স্ত্রীলোকের অলঙ্কার বিক্রয়লব্ধ নহে। উহা তাহার ভিক্ষাপ্রাপ্ত সম্পত্তি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। ভিক্ষায় এত টাকা সঞ্চিত হয়?

ননী। হুজুর! এ ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ভিখারীরা সকলেরই কৃপা লাভ করিয়া থাকে। আমি জানি, একজন সামান্য অন্ধের অনেকগুলি মোহর, তিন কলসী টাকা ও দুই কলসী আদলা পয়সা সম্পত্তি ছিল।

শ্রীশচন্দ্র এ কথায় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "হতে পারে, সে অন্ধ বলিয়া লোকে তাহাকে দয়া করিত। এ ব্যক্তি বলিষ্ঠ—দয়ার পাত্র নহে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। নিশ্চয়ই।

ননীগোপাল কহিল, "ধর্ম্মাবতার! এ আসামীকে জনসাধারণ্যে পাগলা বলিয়া জানে। আমিও তাহাই মনে করিতাম, কিন্তু সুড়োর জঙ্গলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাকে মহদ্ব্যক্তি বলিয়া আমার অনুমান হয়। এরূপ পাগলাকে লোকে আর্থিক সাহায্য কেন, প্রাণদানেও কুণ্ঠিত হয় না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। কি দেখিয়াছেন?

ননী। পুলিসের ইন্স্পেক্টর সাহেব তাহা জানেন, দেখিয়াছি—এ বন্দী গলিত কুষ্ঠব্যাধিপীড়িত ব্যক্তির সেবক, বাতে পঙ্গু নারী, যে চলিতে বসিতে ফিরিতে পারে না, এ বন্দী তাহারই শুশ্রূষাকারী, হিন্দুর জাগ্রতদেবী মা কালীর উপাসক, পূজক।

ইন্স্পেক্টর সাহেব ননীগোপালের এ বাক্যের সমর্থন করিলেন।

শ্রীশচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার, আমার মনে হয়, বন্দীর আত্মরক্ষা করিবার এ এক অভিনব কৌশল—ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এই বলিয়া তিনি আসামীর বিপক্ষে নানারূপ দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

ননীগোপাল একে একে তাঁহার বাক্যের যথাযথ প্রতিবাদ করিয়া

বিচারককে বুঝাইয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এ রমণী নিরুদ্দিষ্টা হইয়াছে এক বৎসর, আর এ কীর্ত্তিবাস এরূপ কার্য্য করিতেছে, প্রায় পাঁচ বৎসর কাল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইহার প্রমাণ।

ননী। পাঁচ বৎসর হইতে এ বন্দী এক অন্ধ, এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ ও এক বাতে পঙ্গু নারীকে সেই জঙ্গলে রাখিয়া সেবা করিতেছে।

ইহা শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "হ'তে পারে, তখন ইহার অর্থ ছিল না। পরে শ্যামাঙ্গিনীর অর্থ পাইয়া এ ব্যক্তি আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"

কীর্ত্তিবাস সহাস্যবদনে কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি যে স্বীকারোক্তি পত্র দাখিল করিয়াছি, ইহা ছাড়া আর আমার কিছু বলিবার নাই; তবে এইমাত্র বলি যে, যে সকল সদাশয় ব্যক্তি আমায় সদাসর্ব্বদা অর্থ-দানে সাহায্য করিতেন, তাহাদের মধ্যে আজ ঐ একজন সাহেবকে উপস্থিত দেখিতেছি, উনি আমায় পাঁচ টাকার কম কখনও ভিক্ষা দেন নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সে ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন। দেখিলেন, ইনি তাঁহার ঔরসজাত পুত্র, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "তুমি ইহাকে অর্থদান করিতে কেন?"

যুবক কহিলেন, "এ পাগলা—আমার সহিত ইংরাজি ভাষায় দক্ষতার সহিত কথোপকথন করিত, উত্তম গান শোনাইত, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিত, সেইজন্য ইহার উপর শ্রদ্ধাবশতঃ আমি যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাঁহার স্বীকারোক্তি লিখিয়া লইলেন। অতঃ-পর বন্দীকে বলিলেন, "তুমি এ স্ত্রীলোককে পাইবামাত্র পুলিসে সংবাদ দাও নাই কেন?"

কীর্ত্তি। ভাবিয়াছিলাম—আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেছি, পুলিসে কেন সংবাদ দিব—বিশেষতঃ রমণী তখন আত্ম পরিচয় দিয়া সাধারণ্যে উপ-স্থিত হইতে চাহে নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট। এ কথা স্ত্রীলোক স্বীকার করিয়াছে।

অতঃপর একজন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি আসামীর স্বীকারোক্তি একবার শুনিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মাবতার! এ সম্বন্ধে কি অনুমতি করেন?"

"আপত্তি নাই।" এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইণ্টারপ্রিটারকে আসামীর স্বীকারোক্তি শুনাইতে বলিলেন, ইণ্টারপ্রিটার সে পত্র পড়ি-লেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—

"আমি সংসার পরিত্যক্ত যুবক, অতি শৈশবে আমার মাতৃবিয়োগ ঘটে, পিসী-মা'র ক্রোড়ে আমি লালিতপালিত হই, পরে পিসী-মা আমার বিবাহ দেন, সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা। তার পর কোন বিষয়-সম্পত্তির জন্য পিসী-মার সহিত আমার পিতার মনোমালিন্য হয়, তাহাতে আমি পিসী-মার পক্ষাবলম্বন করিলে পিতৃপাশে তিরস্কৃত হই। জানি না—শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে আমি সে সংসার ত্যাগ করি, তার পর পাঁচ বৎসরকাল আমি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াই, সন্ন্যাসীর বেশে হিন্দুর প্রত্যেক তীর্থ স্থলে গিয়া ভিক্ষায় কিছু অর্থ প্রাপ্ত হই। যখন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন আমার দেহ ক্ষীণ ও কৃশ ছিল, আজ আমি জটাজুটধারী স্থূলদেহী। পাঁচ বৎসর পরে আমি আমার স্বদেশ জননী জন্মভূমি ভারতবক্ষে ফিরে আসি।

তার পর স্নুড়োর ঐ পতিত জঙ্গল নির্জ্জন ও সুবিস্তৃত দেখিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করি, লোকে আমায় বড় একটা দেখিতে পাইত না। যদিও কেহ দেখিত, সে আমার সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া বিরক্ত করিত না। এ স্থলে আমি কীর্ত্তিবাস বলিয়া পরিচিত হই, তার পর আমি পরোপকার সাধনকল্পে জীবন উৎসর্গ করি। সামান্য শক্তি অনুযায়ী দীনদরিদ্র অন্ধ, আতুর অনাশ্রিত ব্যক্তি পাইলেই সযত্নে স্নুড়োর জঙ্গলে গিয়া তাহাদিগের সেবা করিতাম; আর পাগলার বেশে দিবসে পথে পথে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতাম। এইরূপে আমার জীবন আনন্দে কাটিয়া যাইত, তার পর এক বৎসর হইল, এক দুর্য্যোগময়ী রজনীর মধ্যযামে, আমি যখন নিজ স্বভাব অনুযায়ী কার্য্য করিতেছিলাম, এমন সময়ে বেলেঘাটা ষ্টেসনের অদূরে ঐ ফরিয়াদী পক্ষের রমণীকে আমি মৃতকল্প অবস্থায় ভূতলশায়িনী দেখি; অনাশ্রিতা অবলাকে মাতৃজ্ঞানে ধর্ম্মের নামে স্নুড়োর জঙ্গলে লইয়া যাই। তথায় সেবা-শুশ্রূষা করিলে তাহার চৈতন্য হয়, কিন্তু সে লোকসমাজে পরিচয় দিতে অস্বীকৃতা হইলে, আমি সেই স্থানে রাখিয়া দি। আমার এক সহকারী ছিল—তাহার নাম রামশরণ! বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য্যের অপরূপ তেজে দুর্ব্বল-চিত্ত রামশরণের হৃদয় দ্রব হয়, সে আমার মায়ের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, তার প্রতি পাশব অত্যাচার করিতে যায়। কিন্তু জানি না, কে একজন সদাশয় সাহেব আমার মায়ের সাহায্য করেন, রামশরণ তাঁহার ভয়ে পলায়িত হয়। পরিশেষে সে দুর্ব্বৃত্ত রূপমোহে অন্ধ হ'য়ে, কামনা জর্জ্জরিতচিত্তে আমার অনিষ্ট চিন্তায়, আমায় এ অবস্থায় ফেলিয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—আমি নিরপরাধী, তবে আমার সহায় সাক্ষী নাই—ধর্ম্মাবতারের সুবিচারে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, সে শাস্তি আমায় প্রদান করুন—আমি অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিব।"

এ স্বীকারোক্তি শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র একটু বিস্মিত হইলেন। ভাবি-লেন, "কে এ কীর্ত্তিবাস?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাবয়ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

ব্যারিষ্টারপ্রবর কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এ বন্দীর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ যে, সে বাল্যকালে তাহার পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে, সংসার ত্যাগ করে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি অসচ্চরিত্রশীল, পিতার অবাধ্য, নতুবা বাল্যে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইবে কেন?"

ননীগোপাল ব্যারিষ্টারের এ কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "আর আমি বলি, ধর্ম্মাবতার! এ ব্যক্তি সচ্চরিত্রবান্, এ শৈশবে মাতৃহারা হয়েছিল। বোধ হয়, ইহার পিতা আবার দারপরিগ্রহ করিয়া এ প্রথম পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে অনাদর করেন, যুবকের পিসী-মা, যাঁহার যত্নে এ ব্যক্তি লালিতপালিত হইয়াছিল, তাঁহার সহিত ইহার পিতা কপটতা করেন, সেই দুঃখে স্বেচ্ছায় এ যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। বন্দীর উপস্থিত আচার-ব্যবহারে উহার উপর আমার শেষোক্ত ধারণাই বলবতী হয়।

অতঃপর ব্যারিষ্টার বন্দীকে জেরা করিলেন, "তোমার প্রকৃত নাম ও পদবী কি?"

"সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়।"

"তোমার পিতার নাম।"

"শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

ইহা শুনিবামাত্র শ্রীশচন্দ্র চমকিত হইলেন। মনে-মনে ভাবিলেন, "শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সাতকড়ি? তবে কি এ বন্দী আমার সেই স্নেহের নিরুদ্দিষ্ট সাতকড়ি! দয়াময়, এ কি ছলনা তোমার? যাহা হোক্,

ধর্ম্মাধিকরণে আমি এ মোকদ্দমায় উপস্থিত। এ স্থলে পুত্র স্নেহ যেন না আমায় বিচলিত করিতে পারে।"

"তোমার আর সহোদর আছে?"

"না, আমিই আমার মায়ের একমাত্র পুত্র, দুর্ভাগ্যবশতঃ শৈশবেই মা'র স্নেহে বঞ্চিত হয়েছি।"

"তোমার পিতা কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।"

"ওকালতীতে।"

"তুমি কি উকীলের পুত্র?"

বন্দী নীরব রহিল, কোন উত্তর দিল না।

শ্রীশচন্দ্র আর জেরা করিতে দিলেন না, তিনি অবসন্নচিত্তে আপনার জীবনের অতীত ঘটনা লইয়া মনের মধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এদিকে ননীগোপাল বন্দীর পরিচয় পাইয়া উত্তেজিত হৃদয়ে তাহার সাপক্ষে নানারূপ যুক্তিপূর্ণ তর্ক আরম্ভ করিল। তাহা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "এ মোকদ্দমা বড়ই রহস্যপূর্ণ—সে পলাতক রামশরণকে না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহার শেষ হওয়া দুরূহ।"

ননীগোপাল জামিনে বন্দীকে খালাস দিবার জন্য আবেদন করিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "ইহার জামিন কে হইবে? এ ব্যক্তির উপর যে গুরুতর অপরাধ আরোপিত হইয়াছে, তাহাতে উপযুক্ত জামিন হইলে এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ বিবেচনা করিতে পারি।"

শ্রীশচন্দ্র নীরবে অশ্রুমোচন করিলেন, তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। এই সময়ে একজন সাহেব আসিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এ ব্যক্তির জামিন আমি। আমার পরিচয় এ কার্ডে অবগত হউন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট কার্ড দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল প্রাণে কহিলেন, "মিঃ কুক!

আমি এ রহস্য বুঝিতে পারিতেছি না। আপনিই কি সে ফরিয়াদী পক্ষের রমণীকে রামশরণের পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ?"

মিঃ কুকের নাম শুনিয়া পুলিস প্রহরীরা সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তিনি ডিটেক্‌টিভ পুলিস বিভাগের বিজ্ঞতম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মিঃ কুক কহিলেন, "হাঁ, ধর্ম্মাবতার! আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এ বন্দী নিরপরাধী—সাধু, পরহিতাকাঙ্ক্ষী নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমিক। দুর্ব্বৃত্ত রামশরণ অতি শঠ—অতি ছল, সেই এ ব্যক্তিকে বিপদে ফেলিয়াছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি কি এ যুবকের বিষয় কিছু অবগত আছেন ?

মিঃ কুক। আজ্ঞা হাঁ, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আমি ইহার কার্য্যাবলীর উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলাম, রাখিয়া ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। এ জঙ্গলে কীর্ত্তিবাস, পথে পাগল—আদালতে বন্দী। যে রাত্রে এ শ্যামাঙ্গিনীকে পথ হইতে কুড়াইয়া লইয়া যায়, সে রাত্রিতে আমি হাবার ছদ্মবেশে ইহার অনুসরণ করি, তখন রমণী নিরালঙ্কারা ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। দুঃখের বিষয় সে রামশরণের কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না।

"অসম্ভব! সে নরাধম আমার করায়ত্ত।" এই বলিয়া মিঃ কুক প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ রামশরণকে আদালতে উপস্থিত করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব কহিলেন, "এই সে দুর্ব্বৃত্ত।"

রামশরণের হৃদয়ের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে আদালতে আত্মদোষ স্বীকার করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট কীর্ত্তিবাসকে মুক্তি দিলেন। রামশরণ হাজতে গেল।

এই সময়ে আদালতে একজন অপরিষ্কার পরিচ্ছদধারী ক্ষীণকায়

ব্যক্তি বগলে কতকগুলি কাপড়ের বোঝা লইয়া আসিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমায় শাস্তি দিন, আমায় শাস্তি দিন!"

প্রহরিগণ তাহাকে উন্মাদ বলিয়া দূর করিবার উপক্রম করিলে সে কহিল, "আমি পাগল নই—আমি চোর, ডাকাত দস্যু। ধর্ম্মাবতার! শাস্তি দিন—আমায় শাস্তি দিন!"

শ্যামাঙ্গিনীর সতীন-পুত্রগণ আগন্তুককে দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রকে কহিলেন, "এই ব্যক্তি আমাদিগের বাটীর সরকার ছিল, উপস্থিত উন্মাদ দেখিতেছি।"

শ্রীশচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। আগন্তুক কাপড়ের ভিতর হইতে অলঙ্কার বাহির করিয়া কহিল, "এই নিন ধর্ম্মাবতার! আমার মায়ের অলঙ্কার নিন, এই অলঙ্কারই আমার কণ্টকস্বরূপ—ইহার জন্য আমি এক বৎসরকাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, ভয়ে নির্জ্জনে লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু আর সহ্য হয় না। কুক্ষণে আমার এ অলঙ্কার আত্মসাৎ করিবার কামনা হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল; মা আমার সাধ্বী সতী, তাঁর উপকার করিতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে আসিয়া আমার এ পাপ অভিসন্ধি উদয় হয়, আমি তাঁর অলঙ্কার চুরি করিয়াছিলাম; কিন্তু চুরির দুই-একদিন পর হইতেই আমার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়; পাছে ধরা পড়ি, সেই ভয়ে এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি। আজ আমি নিরপরাধীকে মুক্তি দিতে এসেছি। আমায় শাস্তি দিন, হুজুর! আমায় শাস্তি দিন!"

ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশচন্দ্রের প্রদত্ত অলঙ্কারের তালিকার সহিত সেই ব্যক্তির প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি মিলাইয়া পাইলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই এই ঘটনায় চমৎকৃত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কহিলেন, "ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ যে, এ নির্দোষ

সাতকড়ি আমার দ্বারা বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হয় নাই, এক্ষণে ইহার মুক্তিতে আমি বড় সুখী।”

সরকার আইনমতে বন্দী হইল। কীর্ত্তিবাস মুক্তি পাইয়া ননী-গোপালকে তাহার পক্ষসমর্থনার্থ কৃতজ্ঞতা জানাইল, আর শ্রীশচন্দ্র সাতকড়ির পরিচয়ে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। রামশরণ ও সরকারের বিচার অন্য দিনের জন্য স্থগিদ রহিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হেমলতার শেষ

যোগমায়ার মৃত্যুতে সুরেন্দ্রনাথ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহার উপর হেমলতার অসুখে তিনি আরও বিচলিত হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ হেমলতাকে ভগবতীচরণের বাটী হইতে স্বীয় বাটীতে আনিয়া কলিকাতার যত বড় বড় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করিয়াও বিশেষ কোন ফল পান নাই। আজ হেমলতার অসুখ বড় বেশী, তাঁহার আত্মীয়স্বজন কেহই এ দুর্দ্দিনে আসে নাই, সমাজের শৃঙ্খলা সংরক্ষণে পাড়াপ্রতিবাসীরা কেহই তাঁহার মুখ চাহে নাই। সুরেন্দ্রনাথ বহু অর্থব্যয় করিয়া হেমলতার শুশ্রূষার জন্য বিভিন্ন জাতির দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন করিয়া দিত। সুরেন্দ্রনাথ আহার-নিদ্রা কাজ-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, অহঃরহ হেমলতার শিয়রে বসিয়া তাহার আরোগ্য কামনা করিতেন। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার বড় সাধে বাদ সাধিল, এক ডাক্তার হেমলতার জীবনের আশা নাই বলিয়া জবাব দিলেও, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার উপর অবিশ্বাস করিয়া, অপর ডাক্তার আনিতেন, আজ তিনি দুই-তিনজন প্রবীণ ডাক্তার আনিয়া তাঁহাদিগকে সানুনয়ে বলিলেন, "দেখুন, যদি কোন প্রতিকার করিতে পারেন, আপনাদের চিকিৎসা গ্রন্থে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতম ঔষধ আছে, তাহা দিয়া আমার পত্নীকে আরোগ্য করুন, আমি আজীবন আপনাদের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিব; আমি আমার সর্ব্বস্বের বিনিময়েও এ স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলে সুখী হইব।"

ইহা শুনিয়া একজন বিজ্ঞতম ডাক্তার কহিলেন, "সুরেন্দ্র বাবু! অধীর হইবেন না, আমরা সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য—আপনি এ সাধ্বীর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন। ইঁহার বাঁচিবার কোন আশা নাই, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

সুরেন্দ্রনাথ আকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন উপায় নাই?"

ডাক্তার কহিলেন, "না, দেখিতেছেন না, ইঁহার চৈতন্য নাই—নাড়ী বসিয়া গিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু ইঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।"

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উপস্থিত একজন ইংরাজ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাবু! রমণীর দেহে আর প্রাণ নাই, তোমার সকল আশা, চেষ্টা বিফল।"

সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, সত্যসত্যই হেমলতা চির-দিনের জন্য মহা নিদ্রায় চক্ষু নিমীলিত করিয়াছে। আর সে উঠিবে না, আর সে জাগিবে না। আর সে সুরেন্দ্রের দুঃখে কাঁদিবে না, সুখে হাসিবে না, তাহার সব ফুরাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ ডাক্তারদিগকে বিদায় দিয়া ভগবতীচরণকে সংবাদ পাঠাইলেন, এবং নিজে চেতনাহীন, স্পন্দনহীন হেমলতার মুখখানি শেষবারের জন্য হৃদয় ও নয়নে যতটুকু ধরে, তাহা দেখিয়া অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। পত্নীশোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

এ দুঃসংবাদ শুনিয়াই ভগবতীচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে অধীর দেখিয়া কহিলেন, "বেয়াই, শোক পরি-ত্যাগ করুন। জগতে যে মরে, সে কিছুই দেখিতে আসে না, কর্ম্ম-ফলের গুণে নূতন জীবনে নূতন ভাবে উদ্দীপিত হয়; যাহারা বাঁচিয়া

থাকে, তাহারাই মৃতব্যক্তির জন্য হা হুতাশ করে। মন বোঝে না—একই চিন্তাস্রোতে দিন-রাত্রি বয়ে যায়, অথচ এ শোক-[illegible]ায় কোন ফল নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, "সত্য, কিন্তু বেয়াই মশাই! আমি আপনাকে কি বলিয়া জানাইব, কি বলিয়া বুঝাইব যে, আজ আমি কি রত্ন হারা[illegible]াম। সমস্ত জগৎ সংসার আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেও এ পত্নী জীবিত থাকিলে আমি জীবন-সংগ্রামে সমভাবে প্রবৃত্ত থাকিতাম; কিন্তু ইহার মৃত্যুতে আমার সব গেল। এ পত্নীই আমার উন্নতির মূল, সহায় সম্পদে, আশায় নিরাশায় সে সমসুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছে, একদিনের জন্য আমার অবাধ্য হয় নাই; দুর্ভাগ্য আমার, আমি এ রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলাম। এ দেবীস্বরূপিণী রমণী জীবনব্যাপী পরিশ্রমে আমার মনস্তুষ্টিসাধন করিয়াছে, আমি এক্ষণে শোকবিবর্জ্জিতচিত্তে ইহার শেষ-স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখি। সমাজচ্যুত আমরা—লোকবলবিহীন, আসুন বেয়াই! দু'জনেই এ ক্ষীণাঙ্গিনী নারীর সৎকার কার্য্য সমাধা করি; আপনিই আমার একমাত্র সহায়।"

"বেশ, আমি পশ্চাদপদ নহি, ইহা অপেক্ষা মানুষের আর কোন দায় নাই। এ সময়ে আত্মপর, নীচ ও উচ্চ জাতিভেদভাব জলাঞ্জলি দিয়া, সাহায্য প্রার্থনাকারী মাত্রকেই সহায়তা করা আমি যোগ্যতম কাজ মনে করি।" এই বলিয়া ভগবতীচরণ নিজ গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিয়া সুরেন্দ্রনাথের সহিত হেমলতার সৎকারে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃ-মিলন

সেদিন সাতকড়ি শ্রীশচন্দ্র ও ননীগোপালের মহামায়ার অপার করুণা, স্বার্থত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা উত্থাপন করিয়া নিজ বাল্য জীবনকাহিনী কহিতে লাগিলেন, সে সকল কথোপকথনে শ্রীশচন্দ্র মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সাতকড়ি সর্ব্বাগ্রে পিসী-মার কাছে যাইতে ইচ্ছুক হইলে, ননীগোপাল তাহাকে আপন ভবনে লইয়া গিয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র বাটীতে গিয়া কিরণশশীকে জানাইলেন যে, সাতকড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; কিরণশশী সহসা এই সংবাদ শুনিয়া বিস্মিতা হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে সকল কথা বিবৃত করিলেন, ফুলকুমারী বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধান সংবাদ শুনিয়া পুলকিত হৃদয়ে ঈশ্বর সমীপে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। পিসী-মা সাতকড়িকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই—ননীগোপাল তাহাকে সব বুঝাইল, সাতকড়ি বাল্যকালে খেলিতে খেলিতে একবার প্রদীপে হাত দিয়া হস্তের কব্জি পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল। সে স্থানে একটি ক্ষত চিহ্ন ছিল—তাহা দেখিয়া ও সাতকড়ির মুখে সকল ঘটনা শুনিয়া মহামায়ার কোন সন্দেহ রহিল না। সাতকড়ি কহিল, "পিসী-মা, বাল্যে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হ'লেও তোমার করুণায় আমি পরিবর্দ্ধিত হয়েছি, তোমার প্রতি পিতার অন্যায় ব্যবহারে আমি সংসার ত্যাগ করেছিলেম, জানতেম, স্ত্রী আমার তোমার কাছে থাক্‌লে কোন কষ্ট পাবে না।"

মহামায়া কহিল, "বাবা! আমি সেখান হ'তে চ'লে এলেও সে বালিকার চরিত্র যেরূপে গঠিত করেছি, তাতে সে সকলেরই প্রশংসার পাত্রী হয়েছে; তোমার অবর্ত্তমানে বৌ-মা তোমারই মূর্ত্তি মনে জ্ঞানে ধ্যান করেছে। চল, একবার তাকে দেখা দেবে চল, আমি সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।"

এই সময়ে তথায় ক্ষেমঙ্করী প্রবেশ করিয়া কহিল, "সাতকড়ি, আয় বাবা, আর যে তোকে দেখ্তে পাব, এ আশা ছিল না।"

সাতকড়ি তাহার চরণে প্রণত হইয়া কহিল, "বড় মা, বড় মা! তোমরা আমার দেখা পাওনি বটে, কিন্তু আমি তোমাদের সকল খবর রাখ্তেম, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার পর পাঁচ বৎসর তীর্থে ভ্রমণ করি, পাঁচ বৎসরের পর ফিরে এসে দেখ্লেম, আমাদের সে বাড়ী আর নেই। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়েছে, বাড়ীও টুক্রো টুক্রো। এ দেখে আর বাড়ীতে যেতে প্রবৃত্তি হ'ল না। মনের আবেগে এক নূতন খেলায় প্রবৃত্ত হ'লেম; সুখে এক রকম বেশ ছিলেম। প্রাণে শান্তি ছিল—কিন্তু ননীগোপাল আমার উপর গিয়েছে, আমি ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে আবার তোমাদের কোলে ছুটে এসেছি। ছোট ভাই বড় ভাইকে বুকে ক'রে টেনে এনেছে। বড় মা! থাক্তে পার্লেম না, ভায়ের কোলে ছুটে এসেছি।" এই বলিয়া ননীগোপালকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিল।

ননীগোপাল কহিল, "আশীর্ব্বাদ কর দাদা, মা আমার উপর ছোট ভাই দুটীর ভার দিয়ে সংসার পাততে বল্ছেন, তোমাদের আশী-র্ব্বাদে আমি এ সংসারে প্রবেশ ক'রে যেন কখনও অধর্ম্মের পথে পদা-র্পণ না করি। স্বর্গীয় পিতার ন্যায় আমি যেন আজীবন ভাইয়েদের মুখ চেয়ে দিন কাটাতে পারি।"

সাতকড়ি কহিল, "তুমি যথার্থ সুখী ভাই! সংসার-আশ্রমে তোমার ন্যায় আত্মত্যাগ না করলে বড় হওয়া যায় না।"

তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তথায় নৃত্যগোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহা দেখিয়া ননীগোপাল নৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "নৃত্য! সাতকড়ি দাদা এসেছে, চিন্‌তে পার?"

সাতকড়ি কহিল, "শৈশবে দেখেছিলেম, সে আজ বহুদিনের কথা। নৃত্য এখন কি কর্‌ছে?"

ননী। মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পাশ দিয়েছে, আর প্রিয়-গোপাল শিবপুর কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংএ পরীক্ষার জন্য পড়্‌ছে, তার শিবপুরে থাক্‌বার ব্যবস্থা করেছি। এখানে যাতায়াতে পড়ার ব্যাঘাত হ'তে পারে।

মহামায়া কহিল, "এইবার তুমি ভাইয়েদের বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসার গুছিয়ে দাও।"

সাতকড়ি কহিল, "সে ভার তোমার! তুমি হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ মহিলা। ভ্রাতৃস্থানে বিষয়ে বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা হ'য়েও তুমি ভাইয়েদের ইষ্ট-কামনা সমভাবে সাধন করেছ। আর বড় মা! তুমি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। তোমার স্বামীর বিষয় অপরকে ঠকিয়ে নিতে দেখেও তুমি নীরবে তাহা সহ্য করেছ, ছেলেদেরও সহ্য করতে শিখিয়েছ। তুচ্ছ বিষয়ের পরিবর্ত্তে ভগবান্ তোমায় যে পুত্র-রত্ন দিয়েছেন, তাহা বড় একটা কেহ লাভ করে না।

ক্ষেমঙ্করী কহিল, "এখন ওদের রেখে যেতে পার্‌লেই হয়।

মহামায়া হাসিয়া কহিল, "আগে ছেলেদের বিয়ে দাও, নাতি পুতির মুখ দেখ, তার পর মরণ কামনা করো।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সৎ-মা

ফুলকুমারী শ্রীশচন্দ্রের মুখে পতির সংবাদ পাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার আগমন প্রত্যাশা করিতেছিল। মহামায়া সাতকড়িকে সেদিন আসিতে দেয় নাই, সঙ্গে করিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকটে আনিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিল। শ্রীশচন্দ্রও পুত্রকে স্বীয় আলয়ে আনিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিল। আজ প্রভাতোদয় হইয়াছে, এখনও সাতকড়ি না আসাতে শ্রীশচন্দ্র কিরণশশীকে কহিল, "ছেলেটা বড় অভিমানী, একবার মহামায়ার কাছে যাই, গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসি।"

কিরণশশী সাতকড়ির প্রত্যাবর্ত্তনে অন্তরে আনন্দলাভ করে নাই, বরঞ্চ ফুলকুমারীর উপর ঈর্ষা অধিকতর বাড়িয়াছিল। কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া শ্রীশচন্দ্রকে কহিল. "একটু অপেক্ষাই কর না, উতলা হ'য়ো না। সে তোমার ছেলে ত, তুমি তাকে ডেকে এসেছ, তবু এল না—এতই বা অভিমান কিসের?"

শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "কিরণ! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না, সাতকড়ির সন্ধানে আজ আমি কত সুখী। মাতৃহারা পুত্র আমার প্রথম পত্নীর একমাত্র স্মৃতি, তাকে হারিয়ে আমি জীবন্মৃত হয়েছিলেম; অন্তরে অন্তরে অনুতাপানলে পুড়ে মর্‌ছিলেম। আজ দশ বৎসর পরে জীবন-মরণের এই সন্ধিস্থলে এসে চরিত্রবান্ পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হ'য়ে আমি গৌরবান্বিত। সাতকড়ির তুলনা জগতে অতুলনীয়।"

কিরণশশী মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "বৌ-মা! এরই মধ্যে কাজ-কর্ম্মে দূর-ছাই কর্‌ছে, কাল রাত্রে ছোট ছেলেটাকে কাছে ক'রে শুতে

বলেছিলেম ; তাতে তাকে সারা রাত ঘুমোতে দেয়নি, সমস্ত রাত প্রদীপ জ্বালা থাক্‌লে কখনও ঘুম আসে কি ?"

ইহা শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "কিরণ ! কুসংস্কার হৃদয় হ'তে দূর কর। হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে এ সংসারের উন্নতি কামনা করা তোমারই পক্ষে মঙ্গলকর। বড় আশায় আবার তোমায় বিবাহ করেছি, আশায় নৈরাশ করো না, সাতকড়ি আমার বার্দ্ধক্যের এক-মাত্র সম্বল—ঈশ্বরানুগ্রহে ফিরে পেয়েছি, তাকে তোমার পুত্র হ'তে পৃথক্ ভেবো না, বরঞ্চ হিতকারী ভেবো। ইহার বিপরীত আচরণ কর্‌লে, আমরা কেহই সুখী হ'ব না, সংসার শ্মশানে পরিণত হবে। বৌ-মা আমার সাধ্বী, দশ বৎসরকাল আমি তাকে চোখে চোখে রেখেছি, দশ বৎসর তাকে পরীক্ষা করেছি, তার কোন দোষ নাই। যে পতিগতপ্রাণা, পতির দর্শন ও অদর্শনে সমসুখী, একই ধ্যানে মগ্ন থাকে, তাকে অযত্ন ক'রে বৃথা অপযশঃ কিনো না।"

কিরণশশী শ্রীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া একটু লজ্জিতা হইয়া মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "না, তুমি কথাটায় দোষ ধরো না, আমি অবলা, না বুঝে যদি কোন দোষ করি—আমায় শিখিয়ে দিও। আমি তোমায় অসুখী কর্‌তে চাই না—তুমি যাতে সুখী হও, শান্তিলাভ কর, স্ত্রী আমি—সে কাজ করা আমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

তাহারা যখন পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে তথায় অমল আসিয়া কহিল, "বাবা ! পিসী-মা, বড় মা, মনী দাদা আর একজন কে এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে।"

শ্রীশচন্দ্র তাহাদের সযত্নে আপন কক্ষে লইয়া আসিলেন।

ক্ষেমঙ্করী আসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো ! আজ আমাদের বখ্‌শিশ দাও, তোমার হারানিধি ফিরিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীশচন্দ্র সলজ্জভাবে কহিলেন, "বৌ-দিদি! লজ্জা দিও না—আমি তোমাদের কাছে বড় অপরাধী। ননীগোপাল পিতার উপযুক্ত পুত্র। আর সাতকড়ি! তোমার কার্য্যকলাপে আমার মুখোজ্জ্বল হয়েছে, সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তোমার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য সুড়োর জঙ্গলে অতিথিশালা স্থাপনের আদেশ দিয়া তোমার কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিতেছেন। বার্দ্ধক্যের সম্বল তুমি, আজ আমি সংসারের ভার তোমায় দিয়ে খালাস; তুমি মাতৃহীন ব'লে দুঃখিত হও না—নূতন মাকে তোমারই মা ব'লে জেনো।"

সাতকড়ি কহিল, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

এই সময়ে মহামায়া ফুলকুমারীকে তথায় আনিয়া সাতকড়ির হস্তে হস্ত স্থাপন করাইয়া কহিল, "বৌ-মা! আজ আমি দময়ন্তীর ন্যায় আবার তোমায় সাতকড়ির হাতে সঁপে দিলেম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা মনের সুখে ঘর সংসার কর; নূতন বৌ! বৌ-বেটাকে যত্ন ক'রো।"

কিরণশশী সাতকড়িকে সস্নেহে নীরবে আহ্বান করিল।

সাতকড়ি কিরণশশীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা! মা! আমি শৈশবে মা'র স্নেহ হারিয়েছি, তোমার করুণায় ও স্নেহে যেন কখনও না বঞ্চিত হই। সৎ অর্থে উত্তম; যদি তোমার কাছে কখনও কোন দোষে দোষী হই, তা হ'লে "মা"! তুমি "সৎ" ভেবে আমাদের সকল দোষ মার্জ্জনা ক'রো।"

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রনাথের শেষ কার্য্য

সুরেন্দ্রনাথ হেমলতার শ্রাদ্ধাদি সমারোহে সমাধা করিয়া, নিজের বসত্বাটী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, সকলই জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুত্রগণের নামে যথাবিধি উইল করিয়া দিলেন। ননীগোপাল যে হরেন্দ্রনাথকে সৎপথে লইয়া গিয়া অনুপমার সুখ-শান্তি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল, এজন্য তিনি ননীগোপালের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যোগমায়ার বিবাহে সুরেন্দ্রনাথ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন ; যে সামান্য অর্থ সঞ্চিত ছিল, তাহা হইতে মহামায়াকে হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিলেন। এই উইল, কাগজ, বাটীর চাবি ও একখানি পত্র ননীগোপালকে পাঠাইয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথ সংসারত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। ননীগোপাল উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, পত্র পাঠ করিয়া বুঝিলেন, সুরেন্দ্রনাথ মর্ম্মবেদনায় সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ননীগোপাল মহামায়া ও তাহার মাকে উইলের মর্ম্ম জানাইল। ননীগোপালের পত্রমধ্যে একখানি পত্র ছিল মহামায়ার নামে, তাহার ভাবার্থ এই ;—

"মহামায়া! আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে, বোধ হয় তোমার মনে কষ্ট দিয়া আমি যোগমায়াকে তোমার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই হৃদয়ে এ মর্ম্মবিদারক যন্ত্রণা পাইতেছি। তুমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছ, যোগমায়াকে এ ব্রতাবলম্বিনী করিয়া ভালই করিয়াছিলে, অজ্ঞ আমি—বৃথা জ্ঞান-গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া তাহার আবার

বিবাহ দিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। বেশ শিক্ষা লাভ হয়েছে! এ ধর্ম্মের দেশে আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব যত প্রবল থাকে, ততই মঙ্গল। বাল্যে আমরা দাদার অনুকম্পায় নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেম, তাঁর মৃত্যুতে আমরা অধর্ম্মাচরণে বিষয় হস্তগত করেছিলেম; বোধ হয়, সেইজন্যই আমার বংশ বৃদ্ধি হয় নাই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে ক'রে, দাদার ছেলেদের আমি বাড়ী-ঘর উইল করিয়া দিয়াছি, তাহারা এ বিষয়-সম্পত্তি উপভোগ করিলে আমি সুখী হইব। যোগমায়া মরিয়াছে, কিন্তু অনুপমা জীবিতা, তাহার ভার তোমার উপর; তুমি তাঁহাকে দেখিও। আমি আর সংসারে মুখ দেখাইব না, হেমলতার সহিত আমার সব ফুরাইয়াছে। যে টাকা তোমায় দিলাম, ইহা অতি সামান্য—তুমি ইহার সদ্ব্যয় ক'রো।"

তোমার ছোট দাদা

সুরেন

পত্র পড়িয়া মহামায়া কহিল, "কি দুর্দ্দৈব! অহঙ্কারেই ছোট দাদার এই দুর্গতি, সব অদৃষ্ট—মনের অগোচর পাপ নাই, ছোট দাদা অনেক বুঝে বাড়ী ঘর তোমাদের দিয়েছেন—তোমরা ভোগ কর। অনুপমাকে নিজের ভগ্নীর মত দেখো।"

ননীগোপাল কহিল, "হরেন্দ্র এখন আর তাহাকে অযত্ন করে না, সে আমার অনুগত, বেশ দু' পয়সা রোজগার করছে?"

মহামায়া কহিল, "তুমিই তার উন্নতির মূল।"

ননীগোপাল বলিল, "মূল সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, আমরা নিমিত্তভাগী।

উপসংহার

রামশরণ ও সরকার আদালতে আত্মদোষ স্বীকার করিলে ম্যাজি-ষ্ট্রেট রামশরণকে ভীষণ প্রবঞ্চনা ও নরহত্যা অপরাধে সাত বৎসরকাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ভোগ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সরকারকে ধরিবার কোন উপায় ছিল না, সে আত্মসমর্পণ করিলে বিচারক তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া চরিত্র সংশোধনের জন্য ছয় মাস বিনা পরিশ্রমে কারারুদ্ধ থাকিবার বিধান করেন। শ্যামাঙ্গিনী নিজ অলঙ্কারাদি ফিরিয়া পাইয়াছিল, সতীন পুত্রগণ তাহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র জানিয়া তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়াছিল; সে তথায় গিয়া স্বীয় ভবনে এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজায় চিত্তনিবেশ করিয়াছিল। সাতকড়ি সময়ে সময়ে তথায় গিয়া শ্যামাঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিত। সুড়োর জঙ্গলে যে সকল অনাথা আতুর নরনারী ছিল, তাহাদের তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়াছিল, হরেশ ও জীবনচন্দ্র। তাঁহারা জীবনের অবশিষ্টকাল সাতকড়ির ন্যায় পরোপকারসাধনে কৃত-সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সাতকড়ি শ্রীশচন্দ্র ও পিসী-মার অনুরোধে সংসারে লিপ্ত থাকিয়াও সুড়োর জঙ্গলে আতুর অনাথাদিগের সেবা পরিত্যাগ করে নাই, ধর্ম্মে তাহার মতি অচল অটল ছিল।

ননীগোপাল সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে উঠিয়া গিয়া বসবাস করিয়াছিল, এবং পুলিশ-কোর্টে ওকালতীতে পিতার পসার লাভে বিবাহ করিয়া, দিন দিন উন্নতির সোপানারূঢ় হইয়াছিল; সে কনিষ্ঠদ্বয়ের সহিত

সম্মিলিতভাবে থাকিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত একান্নভুক্ত ছিল। ভ্রাতৃদ্বয় তাহার অনুগত হইয়া ডাক্তারী ও ওভারসীয়ারী কার্য্যে সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিল। আর সুরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়া কিছু-দিন পুরীধাম শ্রীক্ষেত্রে—যথায় উচ্চ নীচ জাতিভেদ নাই—শূদ্র নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলিয়া দেয়, সেই পবিত্র স্থানে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুশোচনায় তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। নিজ জীবনের উপর ঘৃণা হওয়ায়, তিনি এক গভীর যামিনীতে আত্ম-হত্যা করিবার আশায় সাগরতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন আকাশে শশধর উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিলেন, তাঁহার সেই স্নিগ্ধ শীতল জ্যোতিঃ বীচিমালা সংক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষে এক অনুপম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সাগরের অনতিদূরে বসিয়া একটা পাগলী আপনার মনে গাহিতে-ছিল।

গীত।

আমার সব নিয়েছে,
বাকি রেখেছে আর কি?
জীবন যৌবন সবই দিলাম,
সবাই করে এখন ছি—ছি—ছি!
ঠকিয়ে, মজিয়ে, ভাবিয়ে, কাঁদিয়ে
লাভ কি পেলে শেষে,
তুমি কাটাও দিন হেসে খেলে—
আমি মরি যে আপ্‌শোষে।
আমি ত সব দিয়েছি, প্রতিদান তার
কবে নিয়েছি ?

সুরেন্দ্রনাথ এই সঙ্গীত মুখরিত সৌন্দর্য্য সম্পদময়ী যামিনীতে উন্মত্তের ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,"কে এ সুখযামিনীতে হতাশপ্রাণে সকরুণ সঙ্গীত গায়? এ যে আমারই জীবনের অভিব্যক্তি! হাঃ হাঃ হাঃ! এ আমার বড় সুখের রাত্রি, এমনই চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে আমি হেমলতার সঙ্গে থেকে কতই না সুখের কল্পনা করেছি, আজ সে হেমলতা নাই; সে যেখানে আছে, সে স্থানের পথ দেখাবার জন্যই কি নিশানাথ! তুমি এত উজ্জ্বলভাবে অনন্ত অম্বরে বিরাজিত? আর কল্লোলিত বারিধি! তুমি কি আমার হেমকে স্বীয় বক্ষে ধারণ ক'রে, আজ আনন্দে এমন উচ্ছ্বাস পূর্ণ? না—না—হেমলতার কাছে আর আমার স্থান নাই, সে স্বরগের দেবী, আমি নীরয়ের যাত্রী, তাই বুঝি ঐ উত্তাল তরঙ্গমালা তালে তালে ছুটে এসে আমায় ভয় দেখাচ্ছে? এই বালুকা সমাকীর্ণ স্থানের প্রত্যেক রেণুটী পর্য্যন্ত আমার পদতল হ'তে সরে পড়্ছে? এখানেও কি সমাজের ভয় আছে? এখানেও কি আমায় সমাজচ্যুত দাম্ভিক অহঙ্কারী ব'লে সাগরের নীল জলরাশি শুকিয়ে যাবে? না—না—তা হ'বে না! যে অনুতাপানলে আমি পুড়ে মর্‌ছি, সে অনল নির্ব্বাপিত কর্‌তে এ সাগরই সক্ষম। শশধর! যদি কেউ কখনও আমার সন্ধান করে, তা হ'লে ব'লো, সমাজদ্রোহী সুরেন্দ্রের মৃতদেহ বহন কর্‌বার লোকাভাবে, সে স্বেচ্ছায় বারিধিবক্ষে ঝাঁপ দিয়াছে।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ সফেণতরঙ্গান্বিত সাগরে লাফাইয়া পড়িলেন। অনন্ত অসীম জলরাশিতে তাঁহার ক্ষুদ্র বপু কোথায় মিলাইয়া গেল, তাহার সন্ধান হইল না।

সমাপ্ত